তথ্যের আলোকে

ত্রিপুরার অতীত ও বর্তমান

মোহনলাল সাহা

তথ্যের আলোকে

ত্রিপুরার অতীত ও বর্তমান

মোহনলাল সাহা

ISBN 81-8306-014-5

তথ্যের আলোকে ত্রিপুরার অতীত ও বর্তমান

TATHYER ALOKE TRIPURAR ATEET O BARTAMAN

a collection of bengali essays

by Mohanlal Saha.

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৫

প্রচ্ছদ ঃ স্বপন নন্দী

ভাষা প্রকাশন-এর পক্ষে প্রকাশ করেছেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, 'শান্তি কুটির', কৃষ্ণনগর, নতুনপল্লী, আগরতলা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা থেকে। মুদ্রণ, কমলা প্রেস, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৬।

e-mail : bhasatripura@rediffmail.com
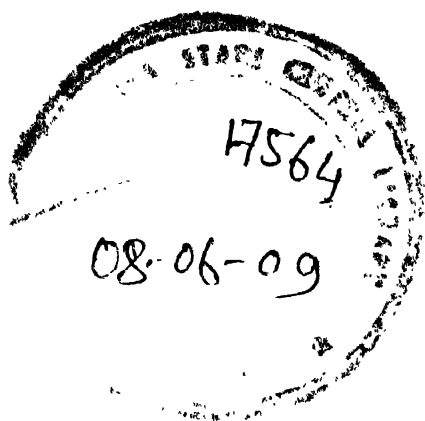
মূল্য ঃ ৬৫ টাকা।

পিতৃদেব স্বর্গীয় অটলবিহারী সাহা
মাতৃদেবী শ্রীমতী রেণুবালা সাহা

প্রাক্‌কথন

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। বর্তমান ত্রিপুরা এককালে পার্বত্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত ছিলো। এই পার্বত্য ত্রিপুরা ছিলো বৃহৎ-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। তখন এর ভৌগোলিক সীমানাও ছিলো অনেক বিস্তৃত। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালির বেশ কিছু এলাকা (১.৪০৮ বর্গ কিলোমিটার), যা চাকলা-রোশনাবাদ নামে পরিচিত, তা ছিলো ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই রাজ্যের বিশিষ্টতার পরিচয় তার ঐতিহ্য ও মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে। বিশেষ করে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য সত্যিই গর্ব করার মতো। তাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এই রাজ্যের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। কমপক্ষে সাড়ে তিনশো বছর ধরে এখানে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। সুদীর্ঘকাল এখানে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাভাষা। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে (১৮৬২-'৯৬ ইং), বাংলাভাষা যথার্থ প্রশাসনিক ভাষায় পরিণত হয়, যা বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডেও তখন ছিলো অকল্পনীয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রাজাদের বাংলাভাষার প্রচণ্ড ভালোবাসার কথা উপলব্ধি করে এবং তাঁদের যথার্থ ঔদার্যের জন্য সাতবার এ রাজ্যে এসেছেন। তিনি ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন', 'মুকুট' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ত্রিপুরার ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবময় দিনের কথা থেকে আধুনিক ত্রিপুরার সঙ্কটময় অবস্থার তথ্যপূর্ণ পরিচয় একটি গ্রন্থের মধ্যে পাওয়ার আকাঙক্ষা ছিলো আমাদের। ত্রিপুরার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী মোহনলাল সাহা মহাশয় আমাদের সেই আকাঙক্ষাকে পূর্ণ করেছেন। তাঁর ইতিহাস-সচেতনতা ও তথ্য-নিষ্ঠা সুবিদিত। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধে তথ্য ও যুক্তির যথাযথ সম্মিলন ঘটায় প্রবন্ধগুলি শুধু যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, ত্রিপুরা সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। ত্রিপুরার উন্নতি, ত্রিপুরার কল্যাণসাধন লেখকের জীবনের ব্রত। আজীবন তিনি ত্রিপুরার প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ত্রিপুরার রেলপথ সম্প্রসারণ, ত্রিপুরায় প্রাপ্ত গ্যাসের সদ্‌ব্যবহার, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ত্রিপুরার জনগণকে তিনি যেমন সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। ত্রিপুরার বর্তমান সঙ্কটের বিষয়েও তিনি সচেতন। মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ যে রাজ্যের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য, সেখানে আজ যে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম চলছে তা শ্রী সাহাকে বেদনার্ত করে তুলেছে। তিনি এই সংঘর্ষের সমাধানের পথ সন্ধান করেছেন।

শ্রী সাহার প্রবন্ধ সঙ্কলনটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি সত্যিই গর্ব ও আনন্দ বোধ করছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইটি সমস্ত শ্রেণীর পাঠকের আকাঙক্ষা চরিতার্থ করবে।

আমি শ্রী সাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৩রা নভেম্বর, ২০০০ ইং।

ড. শিশির কুমার সিংহ
প্রফেসর তথা বিভাগীয় প্রধান,
বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়,
আগরতলা।

মুখবন্ধ

ত্রিপুরার সুধীসমাজে শ্রী মোহনলাল সাহা প্রাবন্ধিক হিসেবে একটি সুপরিচিত নাম। বৈষয়িক জীবনের বৃত্তিগত দায়দায়িত্ব পালনের অন্তরালে শ্রী সাহা একটি অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল মনেরও অধিকারী। ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষের জন্য যে তাঁর ভাবনা-জগত আলোড়িত হয়, বর্তমান প্রবন্ধগুলি পড়লে পাঠকবর্গ তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ত্রিপুরার বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রী সাহার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে রেলপথ স্থাপন, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রমাগত অবহেলা ও তার প্রতিকার, বিগত শতকে মহারাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তার দীর্ঘ প্রভাব, যা আজও সমানভাবে উপলব্ধি করা যায় — এসব বিষয়ের উপর শ্রী সাহার তথ্যনিষ্ঠ আলোকপাত ত্রিপুরার বর্তমান তরুণ প্রজন্মের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে বলে মনে হয়। এ রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের সামনে আজ যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, সাফল্যের সঙ্গে তার সম্মুখীন হতে হলে একদিকে প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের সমাহার, আরেকদিকে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি ও সঙ্কল্প। শ্রী সাহার নিবন্ধগুলিতে এ উপাদানসমূহ যথেষ্ট পাওয়া যাবে।

স্মৃতিচারণ একদিকে যেমন মধুর অনুভূতির উৎস, অন্যদিকে তেমনি বহন করে আনে এক অব্যক্ত বেদনার রেশ। মূল্যবান কোন সম্পদ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলে শূন্যতাবোধ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ সবাই আমরা জানি যে, যে দিন পার হয়ে গিয়েছে, আর কোনদিন সে ফিরে আসবে না। শৈশব-কৈশোরে যে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে অনাবিল আনন্দে দিনের অধিকাংশ সময় কেটেযেতো ক্লাসে, খেলার মাঠে, পূজাপ্রাঙ্গণে অথবা মেলা-উৎসবে, তাদের নিয়ে কালেভদ্রে একত্র হতে পারলেও আর আগের ফেলে আসা দিনগুলোর মতো আসর জমানো যাবে না। অনেকের সঙ্গে হয়তো জীবনে আর কোনদিন দেখাও হবে না। এইরকমই হয়। এরই নাম জীবন। যার অপ্রতিরোধ্য যাত্রাপথে আমরা সবাই হারিয়ে যাই। এই বেদনা-মধুর কিছু স্মৃতিকথা পাওয়া যাবে কয়েকটি নিবন্ধে, যেখানে শুধু সহপাঠী সঙ্গীসাথি, প্রণম্য শিক্ষক আর গুরুজনেরাই নন, আছেন পরম আপনজন 'যশোদামাসি'-ও। মার পাতানো বোন 'বৈনারি'— এক স্নেহময়ী আদিবাসী রমণী, ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় যিনি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, ত্রিপুরা আজ অভূতপূর্ব এক চরম দুর্দিনের মধ্য দিয়ে চলেছে, যেখানে সম্প্রীতি, সংহতি, মানবিকতা এবং সৃজনশীল কর্মের আহ্বান বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু হিংসা, বিদ্বেষ আর সংহার রাজনীতির ভয়ঙ্করী নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংসলীলা। এর নাম যদি সমাজ পরিবর্তনের, নবীন রাষ্ট্রনির্মাণের পথনির্দেশ হয়, তাহলে নতুন করে ইতিহাস রচনা করা দরকার। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কোথায়? মুক্তির উপায় কি? এ প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর পাওয়া না গেলেও এবং তা সম্ভবও নয়, নিবন্ধগুলিতে একাধিক স্থানে ইঙ্গিত রয়েছে এই অবস্থার উৎস এবং এর পুষ্টিসাধনের দিকে — যা থেকে পাঠক সঠিক বিশ্লেষণের পথে এগোতে পারবেন। আজ ত্রিপুরার প্রয়োজন মানুষের

চেতনার দুয়ারে নতুন আঘাত হানা। শ্রী সাহার বর্তমান সঙ্কলন এ আঘাত তথা প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে।

শুভেচ্ছা রইলো শ্রী সাহার সজীব লেখনী ত্রিপুরার মানুষকে প্রকৃষ্ট পথের সন্ধান দিক, তরুণ প্রজন্মকে উদ্দীপিত করুক যাতে পাহাড়ি, বাঙ্গালি, মণিপুরী সহ সকলের মিলিত আবাসভূমি ত্রিপুরা আগামীদিনে এক সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় বাসভূমিতে পরিণত হতে পারে।

৭৯ টিলা, কুঞ্জবন,
আগরতলা ৭৯৯০০৬
১৩. ২. ২০০০ ইং

ড. জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা,
ত্রিপুরা।

Oct 3, 2001

Prof. A. K. Chakraborty
Vice-Chancellor

TRIPURA UNIVERSITY
Suryamaninagar 799 130
Tripura West, India

Phone : (0381) 37 4801/4802
E-mail : triadm@dte.vsnl.net.in
Fax (0381) 37 4801

'রাঙামাটির ধূলায় ধূসর' বইটি প্রকাশনায় ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক শ্রী মোহনলাল সাহার তথ্যনিষ্ঠা ও নস্টালজিয়া প্রকাশ পেয়েছে। পেশাগতভাবে ব্যবসাবৃত্তির সাথে যুক্ত থেকেও লেখকের সংবেদনশীল ও সাবলীল লেখনীতে ত্রিপুরার গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বিশেষ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সুদৃঢ় আত্মিক বন্ধনের কথা বইটিতে ফুটে উঠেছে। লেখক ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সংগে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন সমস্যার কথা এবং তার থেকে উত্তরণের পথের দিশাও তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। হিংসায় উন্মত্ত এই ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্যে এখন মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের শিকড় অনেক ক্ষেত্রেই শিথিল হতে চলেছে। লেখক উদাত্ত কণ্ঠে তরুণ প্রজন্মের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন — সমাধানের পথ খুঁজতে। শ্রী সাহার ত্রিপুরার ইতিহাসভিত্তিক ও তথ্যসমৃদ্ধ এই প্রবন্ধ সংকলনটি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে এবং ত্রিপুরা সম্পর্কে উৎসাহী যে কোনও পাঠকের কাছেই মূল্যবান একটি বই হিসেবে সমাদৃত হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস লেখক তার সৃজনশীল লেখনী চালিয়ে যাবেন যা অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে। শ্রী সাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডক্টর অজিত কুমার চক্রবর্তী

অক্টোবর ৩, ২০০১

(ড. অজিত কুমার চক্রবর্তী)
উপাচার্য্য, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Residence : Qrts. No. Type V/22, Kunjaban Township, Kunjaban, Agartala 799 006, Tripura West, India
Phone : (0381) 22 5281/3244 • E-Mail : ajitchakra@hotmail.com

লেখকের নিবেদন

আমাদের সোনালি স্বপ্ন দিয়ে গড়া ত্রিপুরা তথা তার রাজধানী আগরতলা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এর নির্মল মেঘমুক্ত আকাশে আজ অশান্ত ঘন কালোমেঘের ছায়া। কারণ যাই-ই থাকুক না কেন, এর বিভীষিকা আমাদের সুস্থির জীবনের গতি, আনন্দ-উৎসবে এক হয়ে ভাইয়ের সাথে ভাই কাঁধ মিলিয়ে চলার ছন্দ একেবারে ছিন্নভিন্ন করে, বিলীন করে দিয়েছে। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা ছিলো না।

একটা পারস্য প্রবাদ রয়েছে — 'অতীতকে ভুলে যাওয়ার বিপদ হলো অতীতের ভুলগুলি বারেবারে ফিরে আসে'। আমাদের সে সোনালি অতীত আজ কি স্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে! আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের জীবন, যৌবন, স্বপ্ন নিয়েই আমার ধারাবাহিকভাবে লেখার যাত্রা শুরু। এই যাত্রাপথে প্রতিনিয়ত উৎসাহের যোগান দিয়েছে প্রয়াত বন্ধুবর, ত্রিপুরার সংবাদ জগতের প্রবাদপ্রতিম ভূপেন দত্ত ভৌমিক। তার প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার প্রায় জন্মলগ্নে নিজ বৃত্তি থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গেছে সে আমাকে লেখালেখির জগতে। আর অগ্রজপ্রতিম বরিষ্ঠ সাংবাদিক, লেখক, কবি মৃণালকান্তি কর একেবারে ঘাড়ে ধরে লেখা আদায় করে ছেড়েছেন প্রয়োজনে। গ্রন্থের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধই 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি আগরতলা পুরসভার ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে (১৯৯৮ইং) প্রকাশিত 'পুর সংবাদ'-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

দীর্ঘদিনের এই লেখাগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, তার উদ্যোগ নিতে আপনজনেরা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন সুযোগ পেলেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, অগ্রজপ্রতিম সুধারঞ্জন ভট্টাচার্য, সুবিমল রায়, লেখক বনবিহারী মোদক, নিধু হাজরা, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অনুজপ্রতিম উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক 'সপ্তর্ষি') প্রমুখ। সাহিত্যিক রাখাল রায়চৌধুরীর সহৃদয়তা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে।

যাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য এ জীবনে, আজ সবচেয়ে বেশি যিনি খুশি হতেন আমার এ গ্রন্থ প্রকাশ দেখে যেতে পারলে, তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব। আমার পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীকেও আজ ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই।

ধর্মপত্নী দীপ্তি সাহা আমার প্রবন্ধের প্রথম শ্রোতা। সাধারণ মানুষের কাছে বোঝার অসুবিধার ক্ষেত্রগুলি যিনি আমায় সবসময় নির্দেশ করে দিতেন। তাই সমগ্র রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমার কন্যাদ্বয় — অর্পিতা ও অর্ণিতা, আত্মজসম দেবাশিস, বিস্ময়, আত্মীয় দিলীপ, রত্না, রীতা, টিঙ্কু, গুড়িয়া, মুন্নি ও কুসুমলাল রায় — এদের সদাজাগ্রত অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার এ লেখা কবেই থেমে যেতো। আমার ভাই মানিক, মণি, বাবুল এবং বোনেরা সকলে আমাকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে।

'ভাষা প্রকাশন ' এই গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় ঋণজালে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের সহৃদয় সহযোগিতার ফলেই প্রকাশনার কাজে হাত দেয়া সম্ভব হয়েছে।

আমাদের শৈশবের স্বপ্ন, যৌবনের লীলাভূমি, অন্তিম কালের আশ্রয়মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর রাঙা মাটির সোনালি অতীতের এই গুটিকয় কথা যদি পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে সমর্থ হয়, তবেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

বর্তমান 'তথ্যের আলোকে ত্রিপুরার অতীত ও বর্তমান' গ্রন্থটি আমার পূর্ববর্তী তথা প্রথম গ্রন্থ 'রাঙামাটির ধূলায় ধূসর'-এরই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। সে কারণেই আমার, পূর্ব গ্রন্থটিতে যে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ ভূমিকা ও মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সেই মূল্যবান বক্তব্যসমূহ পুনর্সংযোজিত করা হলো।

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলির অধিকাংশই ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' থেকে সংগৃহীত। ত্রিপুরার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির ছবি যিনি যক্ষের মতো আগলে ধরে রেখেছেন পুরুষানুক্রমে রাজ্যে বসবাসের উত্তরাধিকারী হয়ে — সেই আমাদের সকলের 'রবিদা' তথা ফটোগ্রাফার রবীন সেনগুপ্তর সংগ্রহ থেকেও কিছু ছবি এখানে সংযোজিত হয়েছে। আমি একান্ত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছেও।

পরিশেষে নমস্কার জানাই পাঠককুলের উদ্দেশে, যাঁরা সাহিত্যের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁদের সুচিন্তিত ও সদাজাগ্রত মতামত আমাকে সঠিক পথের নিশানায় পৌঁছোতে সাহায্য করবে।

বিনীত

১ জানুয়ারী, ২০০৫
আগরতলা।

মোহনলাল সাহা
৬৮, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১।
দূরভাষ ঃ (০৩৮১) ২৩৮৪০২৫/২২২৪২১৭

বি ষ য় সূ চী

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. রাঙামাটির ধূলায় ধূসর
২. যুগদিশারী মহানামব্রত
৩. রচনাসংগ্রহ (১ম) ঃ গান্ধীজী ও নেতাজী
৪. A Socio-Economic Study on Tripura and Railway line extension. [A Research Paper] on process.

রাঙামাটির ধূলায় ধূসর

রাঙামাটির পাহাড়ে সবুজ বনানী ঘেরা গাছের ফাঁকে আজও সূর্যদেবের প্রথম আবির্ভাবের সোনালি আলো লাল মাটিকে আলোকিত করে, সারাদিনের প্রাণের উৎস আলো করে তাপ বিকিরণ করে দিনের শেষে লাজে রাঙা হয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি দেয়। ছায়াঘেরা ঘুঘু ডাকা, মোরামে ছাওয়া পথের বাঁকে ছেলেরা বাঁশি বাজাতে বাজাতে মেঠোপথ ধরে। কাঁচা রাস্তায় ধুলির ঝড় উড়িয়ে 'মুড়ির টিন' বাস ছুটে চলে প্রাণপণে 'কারমাইকেল' সেতু পার হয়ে বিশালগড়ের দিকে। পথের দু'ধারে বিশাল বটগাছের নিবিড় ছায়ায় পথিকজন বিশ্রামরত, মেঠো জলায় ব্যাঙের ফড়ফড়ানি, ছপ্ ছপ্ শব্দে জলের ওপর লাফিয়ে পড়া — এসব দৃশ্য আজ আর নেই। নেই সেই আগরতলাও। এখন আমরা শহুরে। কারমাইকেল ব্রীজ, যার আগের নাম ছিলো লোহার পুল, তার স্থানে হয়েছে জওহর ব্রীজ। টি. এম. সি-র 'মুড়ির টিন' বাস এখন আধুনিক সাজে ডিলাক্স বা সুপার ডিলাক্স বাস হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে ধীরে-সুস্থে চলার কোন পথ নেই। জীবনের সাথে কালের গতিও তীব্র হয়েছে। হাত পাম্প আর গোল্লা সাবানকে আবশ্যিক দ্রব্য বা বিপদের বন্ধু বলে নেওয়া জীপ এখন হয়েছে কমাণ্ডার নামক দস্যু যান। গতির তীব্রতার সাথে সে আজ সমপর্যায়ে প্রাণঘাতী। আরাম-আয়াসে চলার ত্রিপুরা তথা এর রাজধানী আগরতলা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

ছড়ায় পড়েছি, রেল চলে ঝমাঝম্। পা পিছলে আলুর দম। সে অর্থে এখনও আলুর দম হবার ভয়ও নেই। তবে ত্রিপুরায় রাজকুমারের রেল চড়ার সুন্দর গল্প রয়েছে। আগে ছিলো মোগরা রেলস্টেশন, এখন আখাউড়া। ত্রিপুরার রাজকুমার আখাউড়া গিয়ে ছাউনি ফেললেন কলকাতা যাবেন। আগরতলা থেকে গিয়ে সময়মত রেল ধরা যায় না, তাই রেল জংশনে পড়লো রাজকীয় ছাউনি। প্রথম দিনের ট্রেন ছেড়ে দিলেন রাজকুমার। সবেমাত্র এসে ছাউনি ফেলেছেন, তক্ষুনি কি ট্রেনে ওঠা যায়? এটা রাজকীয় কায়দায় অচল। দ্বিতীয় দিন যখন সকালে গাড়ি ছাড়ে রাজকুমার তখন ঘুমে। কে জাগাবে? এত সাহস কার? তৃতীয় দিনে ঘুম থেকে উঠে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়েছেন — এমন সময় বেজে উঠলো সিটি। তাতে কী হয়েছে? রাজার মেজাজের চেয়ে তো ট্রেনের সিটি বড়ো হতে পারে না! কিন্তু ট্রেন তো চলে ইংরেজের সময় ধরে, রাজা চলেন নিজের মর্জিমাফিক। এরপর কোনদিন হয়তো বস্‌রার গোলাপের গন্ধ

ছড়িয়ে খাম্বিরা তামাকের মৌজে ভরা কল্কেতে জ্বালানো টিক্কা লাগিয়েছে মাত্র, ট্রেন এসে পড়লো। এই হুঁকো ফেলে উঠলে জীবনের মৌজ ভরা আনন্দটাই বৃথা। এভাবে আরাম আয়েস করে পঞ্চম দিনে রেলগাড়িতে ওঠা। এখানে জীবন দুলকি চালে চলে। হঠাৎ কিছু করতে হলে ফোর্স করতে হয়। জাপানিরা ফোর্স করেছে। তাই সিঙারবিলে বিমানঘাঁটি হয়ে গেলো বারুদের ধোঁয়ার মধ্যেই। আগরতলা বিমান বন্দর। ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগের প্রাণভোমরা। রাজার দরকার হলো না, তাই ইংরেজদেরও দরকার হলো না। কোন তাড়া নেই। সেজন্য রেলপথ আগরতলার পশ্চিম দুয়ার ছুঁয়ে গিয়েও আগরতলায় ভুলেও ঢুকলো না। আর সেজন্যেই আরাম আয়েসের স্বার্থে জীবনের মন্থরতা, রাজকীয় খানদানি চালচলন এ সব মিলেমিশে আগরতলার এ এক নিজস্ব চরিত্র। এই চরিত্র দিয়েই তাকে আলাদা করে চেনা যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আমাদের আগরতলার নাম কি করে 'আগরতলা' হলো তা নিয়েও নানা মুনির নানা মত। নামের ডুবুরি পণ্ডিতেরা কেউ বলেন সেনাপতি 'আগরফা'-র নাম অনুসারেই আগরতলা নাম। কিন্তু তা মানা যায় যদি তিনি সেনাপতি না হয়ে রাজা হতেন। রাজা থাকতে সেনাপতির নামে রাজধানীর নাম স্বীকার করা যায় না। ত্রিপুরার ইতিহাস ও অন্যান্য ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, আগরফার রাজত্বকাল থেকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত আগরতলার নাম আর দেখা যায় না। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও তা দেখা যায় না। সেখানে আছে — 'Boardering upon bhatty is a very extensive country subject to the king of Triprah', ১৫৮২ খ্রীঃ বাদশাহ্ আকবরের নির্দেশে রাজা টোডরমল রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য বাংলা ও উড়িষ্যাকে ২৪ সরকারে ও ৭৮৭ পরগণায় বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে বাদশা শাহ্জাহানের সময় ৩৪ সরকারে বিভক্ত করতে গিয়েও ত্রিপুরা রাজ্যকে ভাটি প্রদেশের সংলগ্ন স্বাধীন রাজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কেউ কেউ বলেন আগরতলা নাম এসেছে 'ককবরক' ভাষা থেকে। যার মূল অর্থ বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'জলা নিচু জমি'। আগরতলার অধিকাংশ স্থান নাকি তখন ছিলো নিচু জমি। কিন্তু যে সমস্ত স্থানের নামের সাথে 'তলা' রয়েছে তার একটা আলাদা অর্থ রয়েছে — গাছের নিচের জায়গাটা। আমতলা, জামতলা, তালতলা বলতে আমরা বুঝবো সেখানে আম, জাম অথবা তালের সমাহার। আমতলা মানে আম গাছের নিচে, জামতলা মানে জাম গাছের নিচে, তালতলা মানে তাল গাছের নিচে। সেভাবে আগরতলা ভেঙে অর্থ করলে দাঁড়াবে আগর গাছের নিচে। অগুরুর গন্ধ হয় আগর গাছ থেকে। উদ্ভিদবিদরা বলেন, এখানে প্রচুর আগর গাছ ছিলো। তাই আমাদের এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিকভাবে যুক্তিসঙ্গত যে, আগরগাছ বা অগুরু গাছের সমাহার এখানে ছিলো বলে এই জায়গার নাম আগরতলা রাখা হয়েছে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষমতায় (de juer) রাজত্ব করেন (উৎস — রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা — ত্রিপুরা সরকার। পৃঃ-৭)। তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে মহারাজ উপাধি এবং তের তোপ ধ্বনির সেলামী অভিবাদন সহ নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করার অধিকার পান। তখন সেটি ছিলো একটি বিরল সম্মান।

"Her Majesty Queen Victoria was pleased to assume the Imperial crown as Kaiser -i-Hind or Empress of India at an Imperial Assemblage, the first of the three great Darbars held respectively in 1877, 1903 and 1911. The Ruling Chiefs of India attended and received various honours, dignities titles, salutes and honours. Among them Birchandra Manikya received the title of MAHARAJAH as a personal distinction, a Salute of 13 guns and the Banner" (Ref : History of Tripura Compiled by E.F. Sandys : Govt. of Tripura, page-96)

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র রাধাকিশোরকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তার কয়েক বছর পর চতুর্থ পুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্রকে 'বড়ঠাকুর' হিসেবে ঘোষণা করেন। রাধাকিশোর মাণিক্য ও তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করেন, বড়ঠাকুর হিসেবে সমরেন্দ্রচন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেননি। এ নিয়ে বহুদিন মামলা চলে। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষে Viceroy AMPTHILL রাধাকিশোরমাণিক্যের নিযুক্তি আইনত বৈধ বলে নিম্নোক্ত সনদ প্রদান করেন। (Ref. Ibid --- page-82)

But the succession Sanad granted by the Government of India on the 21st June, 1904 puts the succession in a simple and definite basis. It is as follows

SUCCESSION SANAD granted by the GOVERNMENT OF INDIA.

Dated 21st june, 1904.

S A N A D

To
HIS HIGHNESS THE RAJA OF HILL TIPPERAH

Whereas, with a view to continuing the representation of the ruling house and dignity of the State of Hill Tippera, it is desiarable to remove all doubts as to the rule of succession to the Chiefship of the said State and the ownership of the Zemindaries and the property in British India which appertain thereto and are held therewith, it is hereby declared :

1. That the Chiefship of the said State is and shall ever be hereditary in the Deb Barman family of Hill Tippera, of which His Highness Radhakishor Manikya, the present Chief of the said State, is now the lawful and acknowledged

Head.

2. That the Chief of the said State, for the time being, may, from time to time and at any time, nominate and constitute any male member of the said family descended through males from his or any male ancestor of his, to be his Juvaraj or successor to the said Chiefship.

3. That in the event of His Highness Radhakishor Manikya or any succeeding Chief of the said State dying without having nominated and constituted a Juvaraj or successor, his nearest male descendant descended through male, according to the rule of lineal primogeniture, and in default of such descendent, his nearest male heir descended through males from any male ancestor of his, according to the said rule, shall succeed to the said Chiefship, preference in either case being given to those of the whole blood over those of the half blood.

4. That in matters relating to the appointment of a successor and the succession to the said Chiefship not heretofore expressly provided for the usages of the said Raj family shall prevail.

5. That every succession to the said Chiefship shall, as heretofore, require the recognition of the Government of India.

6. Raja Radhakishor Manikya may rest assured that nothing shall disturb the operation of this Sanad, so long as he and his heirs are loyal to the Crown and faithful to the British Government.

(Sd). AMPTHILL
Viceroy and Governor-General
of India.

Simla,
The 21st June, 1904.

আমরা সাবেকি বাসিন্দা, তাই সেই একটু আগে বলা খানদানি চালচলনকে এড়িয়ে চলতে পারি না। আমাদের আগরতলার নিজস্ব চালচলন এটা। হুট করে চলা, দুম করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া, এটা বাংলাদেশ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের আগরতলার কালচার। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভুলে পপ্ মিউজিকে ডুবে থাকা। এসব এদের কালচার হতে পারে, আমাদের নয়। এখনো আমরা মনে মনে গর্ববোধ করি এ রাজ্যের কর্ণেল মহিম ঠাকুরের আতিথ্যে থেকে রবি কবি রাজধানীর কর্ণেলবাড়িতে দেরিতে জাগা কোন বঁধূয়ার সলাজ চাহনিকে নিয়ে রচনা করেছেন অমর সঙ্গীত — "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না বেলা হলো মরি লাজে।" যদিও এ নিয়ে নানান তর্কও রয়েছে। তবুও তর্কবাজরা তর্ক নিয়ে থাকুন, আমাদের আনন্দে বাধা

কোথায়।

প্রথমেই প্রশ্ন আসে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় মিঃ এ. ডব্লিউ. বি. পাওয়ার ইংরেজ সরকার নিয়োজিত ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট। [A.W.B. Power was appointed as the first Political Agent of Tripura of July 3, 1871. He was of the rank of a fourth grade Deputy Commissioner, on Rs.1000. per month. He arrived at Agartala on August 1, and with his assumption of the office began the period of the Political Agency in Tripura.(Ref. : Administration Report of the Political Agency. Hill Tipperah 1872-1878 by Govt. of Tripura, page No.4)] তার কার্যকাল ছিলো ১-৮-১৮৭১ ইং থেকে ২-২-১৮৭৪ ইং পর্যন্ত। বাৎসরিক রাজনৈতিক বিবরণীতে তিনি লিখেছেন— "A municipality was instituted in Agartollah in 1871, of which I am Chairman" Ref.: I bid-- Page-29] এ থেকে জানা যায় যে তখন পৌর কর ধার্য করার প্রয়োজন হয় নি। প্রজারা যারা ছিলেন অধিকাংশই রাজার আত্মীয়-স্বজন, রাজকর্মচারী অথবা তাদের আশ্রিত লোকজন। নানা প্রকার সরকারি জরিমানা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব অথবা রাজকোষের 'জেনারেল ফান্ড' থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হতো। এই তহবিলে ১৮৭২ ইং সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মং ৩,১০০ টাকা। এই টাকা একটি পুল নির্মাণ, বিভিন্ন বাজারে যাওয়ার রাস্তা এবং বাজারের শেড নির্মাণে ব্যয় করা হয়। উল্লিখিত সরকারি তথ্য থেকে জানা যায় তখন আগরতলায় কোন রাস্তাঘাট ছিলো না। সব হাটুরে রাস্তা। আগরতলা থেকে কস্‌বা, কুমিল্লা বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার সড়কই ছিলো এ রাজ্যের প্রধান যোগাযোগের পথ। বর্ষার দিনে নৌকোই ছিলো ভরসা এবং তিনদিন লেগে যেতো এ পথে। অথবা ক্ষেতের আল দিয়ে বা কিছু পায়ে হেঁটে, কিছু হাতির পিঠে করে যাওয়া যেতো অন্যসময়। এ সময় মিঃ পাওয়ার আগরতলা থেকে কস্‌বা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের জন্য রাজদরবারে অনুরোধ রাখেন এবং রাজা নিজস্ব জমিদারদের থেকে এই পথ নির্মাণের যাবতীয় জমি সংগ্রহ করে 'রোড-সেস্' কমিটি থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে রাস্তা নির্মাণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু অর্থাভাবে শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়। ১৮৭৪ ইং মহারাজা রাজ্যের অধিবাসীদের থেকে কর সংগ্রহ করার আইন পাশ করেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির তখন নামে মাত্র অস্তিত্ব ছিলো। ১৮৭৪-৭৫ ইং রাজস্ব বছরে ধার্য করা করের পরিমাণ মাত্র ৮৫ পাউন্ড ৪ শিলিং। তার মধ্যে মাত্র ৩৫ পাঃ ৮ শিঃ আদায় করা সম্ভব হয়। এই আর্থিক বছরে খরচের পরিমাণ ছিলো ৯৯ পাঃ ৪ শিঃ ৯ পেনী। রাজ অনুদান সহ এই সময় মিউনিসিপ্যালিটির আয় ধরা হয়েছে ৭২ পাঃ ৪ শিঃ ৩ $\frac{৪}{৩}$পেনী। ফলে সে বছর রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয় ২৭ পাঃ ০ শিঃ ৫ $\frac{১}{৪}$পেনী। (Ref. :W.W. Hunter : Statistical Account of Bengal. Vol. vi, Hill Tippearh; 1876, London. Page - 496) এ সময় মিউনিসিপ্যালিটি ছিলো নামে মাত্র তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা দেখা দিলো, মিউনিসিপ্যালিটিকে কেউ গ্রাহ্যই করে না। রাজার কথাই আইন। আগরতলার অধিবাসীরা অধিকাংশই রাজার আত্মীয়-স্বজন বা তাদের পরিবারবর্গ অথবা দাস-দাসী। রাজ কর্মচারীরা

কোন সময় কাকে কি কথা বলে কি বিপদে পড়ে সে সম্পর্কে তটস্থ থাকতো। সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহে বিপত্তি দেখা দিলো। তখন ভারপ্রাপ্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন ডব্লিউ. এল. স্যামুয়েলস্ (কার্যকাল ২৬-৪-১৮৭৫ ইং থেকে ২৬-২-১৮৭৬ ইং) ক্যান্টনমেন্ট কমিটির ধাঁচে নিম্নলিখিতভাবে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য নির্বাহের জন্য টাউন কমিটি গঠন করার জন্য মহারাজার দরবারে পরামর্শ প্রেরণ করেন।

সভাপতি হলেন মহারাজা। অন্যান্য পরামর্শদাতারা হলেন, ১) চিফ মেডিক্যাল অফিসার ২) পূর্ত বিভাগের সুপারভাইজার ৩) দেওয়ান অথবা প্রধান জেলাশাসক (সেক্রেটারীও হতে পারে) ৪) পদাধিকার বলে পলিটিক্যাল এজেন্ট একজন সদস্য থাকবেন। সভাপতি হিসেবে রাজা সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে খরচের অনুমোদন এবং অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় আইনের অনুমোদন দিবেন। (Ref. :Administration Report as above Vol. No.1, Govt. of Tripura, Page No.66).

ঈশানচন্দ্র মাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ করেন ১৮৫০ খৃ. ১লা ফেব্রুয়ারী। মহারাজ কুমার নবদ্বীপ দেববর্মণের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আবর্জনার ঝুড়ি' থেকে সে সময়কার আগরতলার রাজপরিবারের আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়। যেমন ঃ

"আয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হয়, তাহার একমাত্র সমাধান থাকে কুসীদজীবীদের হাতে। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে বড় বড় ব্যাপার দূরে থাকুক, নিত্য ছোট ব্যয়ের জন্যই ত্রিপুরার রাজসংসারের উত্তমর্ণের শরণ নেয়া এক নিত্য ব্যাপারের সামিল হইয়া গেল। ত্রিপুরার নৈতিক বায়ুমণ্ডল হীনতার এমন নিম্ন স্তরে নামিয়া গেল যে, রাজার আত্মীয়স্বজন দাস-দাসী পর্যন্ত রাজসংসারে ব্যয় সংকুলানের জন্য শতকরা পঁচিশ টাকা সুদে ধার নিতে থাকলেন"— এ হলো তখনকার রাজকোষের আর্থিক দৈন্যতার চিত্র।

মি. এ. বি. ডব্লু. পাওয়ারের সময় পুর পরিষদের জন্য তিন বর্গ মাইল এলাকা নির্ধারিত হয়। এরই মধ্যে প্রশাসন চালু করার তাগাদা উঠলো। রাজবাড়ির তহবিল থেকে কত অর্থের যোগান সম্ভব? চিন্তা হলো স্বনির্ভর প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস অনুসন্ধান। পার্বত্য ত্রিপুরা ঘাটতি অঞ্চল। যা কিছু আয় তা হলো চাকলা রোশনাবাদের আয়। রাজধানী আগরতলার কাছে রেশমবাগান নামে স্থানটির পরিচিতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁরা জানেন না যে এখানে একদিন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের আমলে ১৯০৫ খ্রী. এই রেশম শিল্পের গবেষণা কেন্দ্র এবং ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং সেদিন রেশম শিল্প শিক্ষার জন্য যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে মহারাজ জাপানে পাঠিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি ছিলো এরকম ঃ

"রেশম বয়ন শিক্ষার সুযোগ দান"
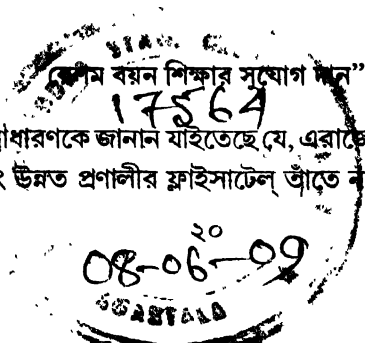
"এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, এরাজ্যের কাশীপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে সূতা প্রস্তুত ও দেশীয় এবং উন্নত প্রণালীর ফ্লাইসাটেল্ তাঁতে নানাবিধ বস্ত্রবয়ন প্রণালী শিক্ষা

দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীগণের যোগ্যতা দেখিয়া তাহাদিগের কয়েকজনকে মাসিক ৫ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে এবং শিক্ষার্থীগণের বাসোপযোগী গৃহও সরকার হইতে দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীগণের কার্য শিক্ষান্তে অন্যূন দুই বৎসরকাল উপযুক্ততা অনুসারে মাসিক ১৫/২০ টাকা বেতনে সরকারে কার্য করিতে হইবে। এই মর্মে এক একখানা একরারনামা দাখিল করিতে হইবে। এ রাজ্যবাসী বিশেষতঃ ঠাকুর বালকগণের আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে। কার্য শিক্ষার্থীগণের আগামী ১৫ই পৌষের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে, ইতি। সন ১৩১৫ ত্রিং (১৯০৫ ইং) তাং ২৯শে অগ্রহায়ণ।

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক
মন্ত্রী অফিস, কৃষি বিভাগ
আগরতলা।

নিম্নলিখিত সরকারী তথ্য মতে ত্রিপুরাতে উৎপাদিত শস্যের বাজারদরথেকে সেই সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। (১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ চৈত্র মাসের ১ম পক্ষ)

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	চাউল	শস্যের মন (৩৭.৫কেজী প্রতি দর				রুই	তিল	মন্তব্য
		উচ্চতর/ নিম্নতর	ধান্য		কার্পাস		উচ্চ দর/নিম্নদর	উচ্চ দর/ নিম্নদর	
			উচ্চ দর/ নিম্নদর আঃ ১টাঃ ২আঃ		উচ্চ দর/ নিম্নদর				
১	সদর বিভাগ	৩ টাকা ৪আনা ২ টাকা ৮ আনা	১টাঃ ৮		২টাঃ ১২আঃ	২টাকা ৪আনা	১২টাঃ ৮আঃ দশটাকা	৩ টাঃ ৮আঃ ২টাঃ ১২ আঃ	
২	কৈলাশহর বিভাগ	৩টাঃ ৮ আঃ ৩টাঃ ৪ আঃ	১টাঃ ১২আঃ	১টঃ ৯আঃ	৪ টাঃ— ৮ আঃ		১০টাঃ	৪টাঃ ৮আঃ ৪টাঃ ৪আঃ	
৩	সোনামোড়া বিভাগ	৪ টাকা/৩টাঃ	২টাঃ	১টাঃ ৪আঃ					
৪	ধর্মনগর বিভাগ	৩টাঃ	২টাঃ ৮আঃ	১টাঃ ৮আঃ	৮টাঃ৬আঃ				

উৎস : ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন। ত্রিপুরা সরকার, ৪৩২ পৃ.

সূত্র :	২ আনা	১২ পয়সা	৮ আনা	৫০ পয়সা
	৩ আনা	১৮ পয়সা	১৪ আনা ৮৮ পয়সা	
	৪ আনা	২৫ পয়সা		

এবার তখনকার সময়ে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা প্রসঙ্গে আসা যাক। সরকারী গণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার লোকসংখ্যা যথাক্রমে ঃ

সদর বিভাগীয়	লোকসংখ্যা	মোট
১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	৯,৫১৩	৬৫,৬১৫
২) সদর বিভাগ (মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া)	৫৬,১০২	

(সূত্র ঃ স্বাধীন ত্রিপুরা-সেন্সাস রিপোর্ট ঃ ত্রিপুরা সরকার ১০-১১ পৃঃ)

১৯৯১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ছিলো ২৭,৫৭,২০৫ জন। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩২ লক্ষ। তা থেকে রাজনৈতিক কারণে বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদের ত্রিপুরাতে স্থায়ী বসবাসের চিত্র ফুটে ওঠে।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক প্রশাসন ও জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র আলাদা।

ত্রিপুরায় ব্যাঙ্কিং প্রথা

ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনের অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা। ত্রিপুরাতে গ্রামীণ মহাজনী লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রথাগত ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা চলে এসেছিলো। মহাজনরা দাদন দিতেন। পরিবর্তে গ্রামীণ চাষীরা তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বা হাতে বোনা বিভিন্ন ধরণের কাপড় বা পোষাক অথবা বাঁশ-বেতের বোনা শিল্পনৈপুণ্য সমৃদ্ধ জিনিষপত্র দিতেন। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও ত্রিপুরায় জিনিষপত্র লেনদেন ব্যবস্থায় বিনিময় প্রথা তথা 'বৈনারী' প্রথা চালু ছিলো। এ প্রথা অনুযায়ী 'বৈনারী' তথা 'সম্পর্ক পাতানো বোন' সমতলের ভাইয়ের ঘরে নানা উৎসব বা অনুষ্ঠানে নিজের হাতে বোনা নানা জিনিষপত্র তথা বাড়িতে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতেন মাথায় কপালে আঁটা ঝোলানো বেতের বা বাঁশের বিশাল প্যাঁটরা তথা থলির ভিতর ঢুকিয়ে। বিনিময়ে শহরের বোনও তাকে তার জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ডাল, তেল,নুন, মরিচ, কাপড়-চোপড় দিত। এইভাবে এক আত্মীয়তার সুমধুর সূত্র গড়ে উঠেছিলো এখানকার আদিবাসীদের সাথে পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে এরাজ্যে

পুনর্বাসিত জনজাতি গোষ্ঠীর।

ত্রিপুরাতে ব্যাঙ্কিং প্রথার আলোচনা করলে প্রথমে আসে গিরীশ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর নাম যা ১লা এপ্রিল ১৯৩০ সালে বিধিবদ্ধ নথীকরণ হয়। কিন্তু দক্ষ পরিচালনার অভাবে তাকে ১০/১/১৯৪৮ তারিখে এবং ৮/১২/৪৯ তারিখে যথাক্রমে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ও কলিকাতা হাইকোর্ট দেউলিয়া ঘোষনা করে। ১৯৩৪ সালে ত্রিপুরার মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ স্থাপিত হয়। এর রেজিস্টার্ড অফিস ছিলো গঙ্গাসাগর। পঁচিশ টাকা দরে প্রতি শেয়ারের মূল্যে বিশ হাজার শেয়ারে নথীভুক্ত হিসাবে এর শেয়ার মূলধন ছিলো পাঁচলক্ষ টাকা। এই ব্যাঙ্কও ১৯/১২/৪৯ ইং তারিখে দেউলিয়া ঘোষিত হয়। সেন্ট্রাল রোডস্থিত প্রয়াত ডাঃ প্রমোদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চেম্বারটি ছিলো এর অফিস কক্ষ। ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক ভারতীয় কোম্পানি আইন-১৯১৩ ইং-এর ৭নং ধারা মোতাবেক নথীভুক্ত হয়ে আখাউড়া (বাংলাদেশ) আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েজের সাথে ব্যবসা আরম্ভ করে। এর সদর দপ্তর ছিলো আগরতলা বর্তমান মোটর স্ট্যান্ড রোডের সরলা স্টোর্স-এর দালানটি। প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের পিতা প্রয়াত হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন প্রধান কার্যকারক। কলকাতায় এর একটি অফিস ছিলো। মূলধন ছিলো ৩০ লক্ষ টাকা। ২৫ টাকা মূল্যের ১,২০,০০০ শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়েছিলো। ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এর শাখা দপ্তর ব্রিটিশ চাকলা-রোশনাবাদ সহ ভারতের অনেক শহর যথা— আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চিটাগাং, ঢাকা, বদরপুর, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে ছিলো। এই ব্যাঙ্কও ৯/৩/১৯৫৪ তারিখে বন্ধ হয়ে দেউলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩২ সালে ব্যাঙ্কিং প্রথা চালু হলেও ১৯৩৫ সালে ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশ ভারত (চাকলা-রোশনাবাদ সহ) ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা বাড়ানো, ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া প্রভৃতি। এ ছাড়াও এই ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক-এ ত্রিপুরার মহারাজার একটি তহবিল ছিলো। এই তহবিল থেকে নামমাত্র সুদে মহারাজার আত্মীয়স্বজনদের ঋণ দেয়া হতো। এছাড়াও ঠাকুর বংশের লোক এবং রাজকর্মচারীরাও এ তহবিল থেকে ঋণ পেতেন।

১৯৪৫ সালে 'ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লি.' নামে অপর একটি নতুন ব্যাঙ্ক 'ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট' মোতাবেক রেজিস্ট্রীকৃত হয় এবং এই অর্থ-আইন পাশ হওয়ার পর পূর্বের স্টেট ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হয়। ধর্মনগর, খোয়াই এবং কৈলাশহরে এর শাখা ছিলো। বর্তমান কংগ্রেস ভবন ছিলো এর কার্যালয়। এ ছাড়াও ছিলো পাইয়োনিয়ার ব্যাঙ্ক। এর কার্যালয় ছিলো বর্তমান মোটরস্ট্যান্ড রোডের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কামান চৌমুহনী শাখা থেকে বাটার দোকান সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত।

রাজ্যে বাণিজ্যের বিস্তারের সাথে সাথে ব্যাঙ্কিং প্রথার প্রসার লাভ করে। এখানের উৎপাদিত বাণিজ্যিক ফসল তখন ছিলো পাট, মেস্তা-পাট, সরিষা এবং কার্পাস ও মরিচ। পরবর্তীকালে ২৫/১/৫৭ ইং তারিখে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি. এবং ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লি. স্থাপিত হয় ২৬/২/১৯৬০ তারিখে। রাজ্যে সর্বভারতীয়

ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এখানে ব্যবসা আরম্ভ করে ১৯৪৯ সালে এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ব্যবসা আরম্ভ করে ১৯৫২ সালে। কার্যালয় ছিলো মোটর স্ট্যান্ড রোডে প্রয়াত উমেশ পালের দালানে এবং পরে উষা মার্কেটে স্থানান্তরিত হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক-এর কার্যালয় ছিলো মন্ত্রী অফিসের ভিতর বর্তমান লোকসেবা আয়োগের সাথে। এই ব্যাঙ্ক রাজ্যের সরকারী ট্রেজারীরও কাজ করে আসছে প্রথম থেকেই। এই ব্যাঙ্ক ব্যবসার বিস্তারিত তথ্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয় বলে প্রাথমিক তথ্য দেয়া হলো।
(Ref : Tripura District Gazetteers, page- 206 to 208)

ত্রিপুরার প্রাচীন অর্থনীতির কাঠামো অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকারী দলিল থেকে যে তথ্য চিত্র পাওয়া যায়, তা নিচে উল্লেখ করা হলো। (উৎস ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন ১৯০৩-১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ— সম্পাদকের নিবেদন, ১৯-২৩ পৃঃ)

অর্থনৈতিক বিবরণ

সমকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও গেজেটের বিভিন্ন সংবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ১৩১৭ ত্রিং (১৯০৭ খ্রীঃ) সনের মাঘ মাসের গেজেট পার্বত্য প্রজাদের দিন মজুরির হারের পরিমাণ জানা যায় 'তৈথুং'-এর 'আজুরা' বা পারিশ্রমিক থেকে। পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের বাধ্যতামূলকভাবে পথে সরকারী কর্মচারীদের মালপত্র পরিবহনের কাজে নিয়োগের প্রথাকে বলে 'তৈথুং'। এই প্রথা অনুসারে সে সময় তৈথুং-এর জন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দৈনিক মজুরী ছিলো যথাক্রমে ৪ আনা ও ৩ আনা। দুই প্রহর পর্যন্ত পরিশ্রমের জন্য অর্ধেক মজুরী ও দুই প্রহরের বেশী সময়ের জন্য পুরো মজুরী দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিলো।

১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩ খ্রীঃ) সনের আষাঢ় মাসের গেজেটে বিগত তিন বছরে রাজ্যের আয়ের যে হিসাব দেওয়া হয় তা থেকে জানা যায় যে, ভূমি রাজস্ব খাতেই তখন পর্যন্ত আয় ছিলো সবচেয়ে বেশী। বনকর এবং তিল কার্পাস সূত্রে আয় ছিলো উল্লেখযোগ্য। ঐ বছরেই পূর্বাপর প্রচলিত 'কজাই মহালে'-র কর হ্রাস করে সরকারী নজর এক টাকা এবং 'কজাইয়ানা' আট আনা অর্থাৎ মোট কর ধার্য হয় ১.৫০ টাকা। এই কজাইয়ানা বা কাজিয়ানা হলো তখনকার নিয়ম অনুসারে মুসলমানদের 'সাদি' বা 'নিকে' করার আগে কর দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নাম রেজিস্ট্রীকরণ। ঐ বছরের ভাদ্র মাসের গেজেটে পার্বত্য প্রজাদের অন্ন-কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতির অনুরূপ কমিটি গঠন ও শস্যভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০ খ্রীঃ) সনের গেজেটে বিচার বিভাগীয় এক মেমো থেকে জানা যায় যে, রাজ্যের উকিলদের মধ্যে পেশা ছাড়াও নানারকম ব্যবসার রেওয়াজ ছিলো এবং ব্যবসা হিসাবে কেউ মুদীর দোকান, কেউ কলুর দোকান, আবার কেউবা সাধারণ পণ্যসামগ্রীর দোকান করতেন। এই ধরণের ব্যবসা পেশার পক্ষে অসম্মানজনক বিবেচনায় চীফ জজের পক্ষ থেকে বলা হয়, "যে সম্মান ও খ্যাতি ওকালতি ব্যবসায়ের অঙ্গ তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভদ্রজনোচিত

অন্য ব্যবসা উকিলগণ করিতে পারিবেন। এরূপ ব্যবসা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসা করিবার জন্য কোন উকিলকে ভবিষ্যতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে আই. এ বা আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রথম শ্রেণীর এবং ম্যাট্রিকুলেশন বা নর্মাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হতো। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাস থেকে ঐ শ্রেণীভেদ লোপ করে শুধু স্নাতক প্রার্থীদের ওকালতি পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেয়া হবে বলে মেমো প্রচারিত হয়।

বাজার দর

আলোচ্য সময়কালের মধ্যে ধান, চাল, কার্পাস, রুই, তিল-এর বাজার দর পাওয়া যায় প্রত্যেক বিভাগের বার্ষিক শস্যের দর থেকে। ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ খ্রীঃ) সনে ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে চালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর ছিলো মণ প্রতি যথাক্রমে বিলোনীয়ায় ৮ টাকা ও ধর্মনগরে ২.৫০ টাকা। ১৩৩০ ত্রিং (১৯২০ খ্রীঃ) সনে ত্রিপুরার মধ্যে চালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর ছিলো মণ প্রতি যথাক্রমে অমরপুরে ৮ টাকা এবং ধর্মনগরে ৪ টাকা। ১৩৫৭ ত্রিং (১৯৪৭ খ্রীঃ) সনে চালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর দেখা যায় যথাক্রমে বিলোনীয়া ২২.৫০ টাকা এবং ধর্মনগরে ১৩ টাকা। অন্যান্য বছরের ধান-চালের দরও সঙ্কলনে উদ্ধৃত হয়েছে। বছর বছর চালের দর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার-চিত্র সহজেই অনুমেয়। ঐ বছরের বৈশাখ মাসেই রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের ৭২ নং আদেশে বলা হয়, "বর্তমান সময়ে সমস্ত আহার্য বস্তুর দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ নিমিত্ত পিয়নাদি নিম্ন কর্মচারী মফঃস্বলে গিয়া দৈনিক প্রাপ্ত খোরাকি চারি আনা দ্বারা দুইবেলা খাইতে পারে না। মাননীয় শ্রীযুক্ত চিফ দেওয়ান রায় বাহাদুর ২৯-২-২০ ইং তারিখে ঐ খোরাকির হার দৈনিক ছয় আনা হওয়া সঙ্গত বলিয়া মঞ্জুরীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীসাক্ষাতে নোট উপস্থিত করেন। শ্রীশ্রীযুক্ত সাক্ষাতের ৮/১২/২৯ ত্রিং আদেশে উহা মঞ্জুর হইয়াছে।"

ধান-চাল ছাড়াও অন্যান্য জিনিসের বাজার দরও মাঝে মাঝে গেজেটে প্রকাশিত হতো। ১৩৪৭ত্রিং (১৯৩৭ খ্রীঃ) সনের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে আগরতলার মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মাংসের দর পাওয়া যায়। মাংস বিক্রি সংক্রান্ত ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, প্রতি সের ছাগ মাংস ছয় আনা, ছাগীর মাংস ছয় আনা, খাসির মাংস ছয় আনা, ভেড়ার মাংস সাত আনা, এবং শুকরের মাংস পাঁচ আনা। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, হিন্দুদের হিন্দু কশাইয়ের কাছ থেকে মাংস নিতে হলে সের প্রতি দু'পয়সা বেশি দিতে হবে। এর অর্থ ইঙ্গিতপূর্ণ। তিন বছর পরে ১৩৫০ ত্রিং (১৯৪০ খ্রীঃ) সনে আগের হারেই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাংস পাওয়া গেলেও খুব সুস্থ, সবলকায় পশুর চর্বিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সব রকম মাংসের দর সের প্রতি মাত্র এক আনা করে বাড়ানো হয়। সমকালীন পণ্যসামগ্রীর দরের পরিচিতি হিসেবে ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৪ খ্রীঃ) সনের সরকার নির্ধারিত পণ্যদ্রব্যের মূল্য তালিকাও বর্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত হয়েছে।

স্টেট ব্যাঙ্ক

১৩৪২ ত্রিং (১৯৩২ খ্রীঃ) সনে ট্রেজারিতে একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ চালু করে বলা হয় যে, "এক, দুই, তিন বা চারি বৎসরের নোটিশে তুলিয়া লওয়ার শর্তে আমানতের জন্য যথাক্রমে বার্ষিক শতকরা ৬,৬।০,৬।।০ ও ৭ টাকা সুদ দেওয়া যাইবে।" অতঃপর ১৩৪৫ ত্রিঃ (১৯৩৫ খ্রীঃ) সনের ভাদ্র মাসে ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক খোলা হয়। ঐ বছরের ফাল্গুন দ্বিতীয় পক্ষের গেজেটে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ব্রিটিশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে মহারাজার বিশেষ আদেশে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। এই ব্যাঙ্ক থেকে সরকারি কর্মচারীদের ঋণ দেওয়া হতো। আমানতের পূর্ব প্রচলিত সুদের হারও এসময় সংশোধন করে ২ বছরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা, ১ বছরের জন্য ৪ টাকা এবং ৬ মাসের জন্য ৩ টাকা ধার্য হয়।

বিবিধ সংবাদ

বর্তমান সঙ্কলনে বিভিন্ন সময়ের গেজেট থেকে উদ্ধৃত কমবেশি উল্লেখযোগ্য আরও নানা ধরনের খবরের সন্ধান পাওয়া যাবে। এই ধরনের বিচিত্র সংবাদেরও কিছু নজির এখানে দেয়া গেলো। কর্তা-প্রভুর শাসনাধীনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য 'ভাবক মহাল' নামে এক শ্রেণীর মহালের খবর দেখা যায় ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ খ্রীঃ) সনের গেজেটে। ফৌজদারী মামলা ছাড়া আর সব ব্যাপারেই এই মহালের মালিক ছিলেন স্বয়ং কর্তা-প্রভু। রাজস্ব আদায়ের সরকারি ব্যবস্থা ছাড়াও আদায়ের কাজে কর্মচারীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য পুণ্যাহ উপলক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নানারকম আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হতো।

ত্রিপুরা রাজ্যে চা-কৃষি প্রবর্তিত হয় ১৩২৭ ত্রিং (১৯১৭ খ্রীঃ) সনে। এই উদ্দেশ্যে '১৩২৭ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন, বা চা-কৃষি সম্বন্ধীয় বিধি' নামে একটি আইন পাশ করে স্টেট গেজেটে প্রচার করা হয়। ঐ আইন বলে দরবারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে চা বাগান স্থাপন বা চা-কৃষি উৎপাদন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। রাজ্যান্তরে চা রপ্তানি প্রসঙ্গে বলা হয় যে, নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনধিক পাঁচ সের পর্যন্ত চা রাজ্যান্তরে প্রেরণ রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে না। ১৩৩৩ ত্রিং (১৯২৩ খ্রীঃ) সনের আষাঢ় মাসের গেজেট থেকে জানা যায়, রাজ্যের নব প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলির মালিকেরা বাগানের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতা জানালে স্থির হয় যে, কাউকে রাজস্ব রেহাই দেয়া হবে না। তবে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করার জন্য সাতটি বাগানের রাজস্ব আদায় এক বছরের জন্য স্থগিত থাকবে এবং ভবিষ্যতে অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করলে ক্রমশ তিন বছরের জন্য তাদের রাজস্ব আদায় স্থগিত থাকতে পারবে। আরও বলা হয় যে, স্থগিত রাজস্বের ওপর বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ ধার্য হবে। তাছাড়া তালুক মঞ্জুরীর মাস থেকে তিন বছর মিনাহ 'মুদ্দত' অর্থাৎ

ব্রেহাইকাল বলে গণ্য হবে। অতঃপর ১৩৪৪ ত্রিং (১৯৩৪ খ্রীঃ) সনের বৈশাখ মাসের গেজেটে চা-কৃষি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রচলিত বিধি বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যক্রমে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 'Indian Tea Control Act, XXIV'-এর বিধানসমূহ সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে চা-কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ধারাগুলি এ রাজ্যে বলবৎ হয়।

সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী একটি জাতীয় পতাকার প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৩৮১ত্রিং (১৯৩১ খ্রীঃ) সনে। স্থির হয় যে, ঐ পতাকা রাজ্যের অফিস ও স্কুল-কলেজে ব্যবহৃত হবে। পতাকার বিবরণ পাওয়া যায় এরকম, "পতাকা দীর্ঘে (দৈর্ঘ?) যে পরিমাণে হইবে প্রস্থে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। পতাকা তিন বর্ণের হইবে। যথা, পীতবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ), (২) শ্বেতবর্ণ (রৌপ্যবর্ণ), রক্তবর্ণ, পতাকার দৈর্ঘের প্রথম অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ পতাকা-যষ্ঠির দিকে) হরিদ্রা বা সুবর্ণবর্ণের হইবে, অপর অর্দ্ধাংশ রক্তবর্ণের হইবে এবং ঠিক মধ্যস্থলে দৈর্ঘের অর্দ্ধাংশ ব্যাস (diameter) বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের একটি বৃত্ত থাকিবে।"

১৩৪৫ ত্রিং (১৯৩৫ খ্রীঃ) সনের ফাল্গুন মাসের এক সার্কুলারে পার্বত্য অঞ্চলে এতাবৎ প্রচলিত জমির মৌখিক কেনাবেচার প্রথা করা হয়। গেজেটে প্রায়ই জুম, আগর নিলামের বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়। এ রাজ্যে কিছুকাল আগেও আগরের ব্যাপক চাষ এবং আগর মহালের অস্তিত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। আগর গাছের আধিক্যবশে 'আগরতলা' নামের উৎপত্তি হয় বলে যে জনশ্রুতি আছে উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তা একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আগরতলা শহরে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে সিনেমা প্রবর্তনের তারিখ পাওয়া যায় ১৩৪৯ ত্রিং (১৯৩৯ খ্রীঃ) সনে পলিটিক্যাল বিভাগের এক আদেশে। ঐ আদেশে ত্রিপুরাসুন্দরী টকিজ এবং ত্রিপুরা টকিজের মাসিক ২৫ টাকা কর প্রদানের ভিত্তিতে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ছয় মাসের জন্য শহরে সিনেমা দেখানোর অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যান্য খবরের মধ্যে ১৩৪৮ ত্রিং (১৯৩৮ খ্রীঃ) সনে 'মহারাজা ম্যাচ ফ্যাকটরী' গঠন এবং এই কোম্পানিকে দেশলাই ছাড়াও ত্রিপুরায় উৎপন্ন কাঁচামালের সাহায্যে বহু রকমের একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ দান উল্লেখযোগ্য। ১৩৫১ ত্রিং (১৯৪১ খ্রীঃ) সনেও 'হোটেল খোসমহল লিমিটেড' নামে আর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আগরতলায় 'একটি হাই ক্লাস হোটেল' খোলার প্রয়োজনের কথাও শোনা যায়।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় মহারাজাদের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের বিবরণ থেকে। ১৩২৩ ত্রিং (১৯১৩ খ্রীঃ) সনে তৎকালীন মহারাজার উদয়পুরে যাত্রার পথসূচি ছিলো — কুমিল্লা পর্যন্ত ট্রেনে, কুমিল্লা থেকে গাড়িতে বিবির বাজার এবং বিবির বাজার থেকে নৌকাপথে উদয়পুর। পরের বছর মাঘ মাসের গেজেট থেকে আরও কয়েকটি বিভাগে যাতায়াতের পথসূচি জানা যায়। যেমন, বিলোনীয়া যেতে হতো ফেণী হয়ে। আখাউড়া থেকে কৈলাশহর, কৈলাশহর থেকে সমসেরনগর স্টেশন হয়ে খোয়াই, সায়েস্তাগঞ্জ স্টেশন হয়ে আগরতলা ইত্যাদি। জলপথে নৌকা ছাড়া হাতিই ছিলো

তখন দূর পথে চলার নিত্যসঙ্গী।

গেজেটে বেসরকারী বিজ্ঞাপন ছাপার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। এখন কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭ খ্রীঃ) সনের গেজেটেই বেসরকারী বিজ্ঞাপন প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেসরকারী বিজ্ঞাপন হিসেবে উকিলের নোটিশ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঘোষণা, বইপত্র প্রকাশ ও জিনিষপত্রের পেটেন্ট ঘোষণা দেখা যায়। বেসরকারী বিজ্ঞাপন ছাড়া বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিও গেজেটে প্রচারিত হতো।

অন্যান্য টুকিটাকি খবরের মধ্যে ত্রিপুরায় গ্যারিসন কোম্পানি গঠন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন, প্রায়ই বন্য হাতির উপদ্রবের কথা, বটতলা থেকে কলেজ টিলা পর্যন্ত বাস চালানোর প্রস্তাব, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতির জন্য ধান-চাল রপ্তানির উপর কর বসানো, পুলিশের পক্ষ থেকে চুরির সংবাদ 'হেঃ চৈঃ এস্তাহার'-এ চুরির বিবরণ প্রকাশ, বার্ষিক মেলা উপলক্ষে তিন গুটি জুয়া খেলা, অস্থিচর্ম ও শৃঙ্গ মহাল ও হাতি খেদার দোযালেব ইজারা দান, রাজধানীতে মেলা অনুষ্ঠান, গণ্ডারের সংখ্যাল্পতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুবাব পক্ষ থেকে ইংবেজ সবকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার বিবরণ পাওয়া যায় ১৩৫০ ত্রিং (১৯৪০ খ্রীঃ) সন থেকে। ঐ সময় প্রত্যেক বিভাগে একটি করে বিভাগীয় যুদ্ধ কমিটি এবং বাজধানীতে একটি কেন্দ্রীয় যুদ্ধ কমিটি গঠিত হয়। যুদ্ধ ভান্ডার গঠিত হয় পরের বছব। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের (১৩৫২ ত্রিং) জানুয়ারী মাস থেকে ত্রিপুরা স্টেট গেজেটে যুদ্ধ বিষয়ক ক্রোড়পত্র বা 'War Supplement' প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ ক্রোড়পত্রে মিত্রপক্ষের জয়লাভের জন্য জনমত গঠন এবং যুদ্ধে সাফল্যের বিবরণ ইংরেজীতে এবং মাঝে মাঝে বাংলায়ও মুদ্রিত হতো। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীর নানা বীরত্বের কাহিনী পাওয়া যায়। যুদ্ধকালীন একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হলো যুদ্ধের দরুণ খাদ্যবস্ত্রের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে মন্ডলের সর্দারদের প্রতি এক নির্দেশনামা প্রচার। ঐ নির্দেশনামায় বলা হয় যে, তারা যেন কৃষিজাত জিনিষপত্রের উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত লম্বা দশটি 'পাছড়া' (আদিবাসী স্ত্রীলোকের পরিধেয়) ছয় মাসের মধ্যে তাদের অধ্যক্ষদের কাছে নগদ মূল্যে বিক্রি করে। প্রত্যেক পাছড়ার মূল্য ধার্য হয ২.৫০ টাকা।

যুদ্ধ সংক্রান্ত ক্রোড়পত্রে লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর বিশেষ বার্তা প্রথমে ইংরেজীতে ছেপে পরে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হতো। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল স্পেশাল কেবল মারফত প্রাপ্ত ৩০০ শব্দের 'exclusive in your area' পর্যায়ে 'আয়রন গার্ড' অভ্যুত্থানের সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'exclusive in your area'-এর বাংলা অনুবাদ 'আপনাদের (ধারণার) সীমার বাইরে' সাংবাদিক জগতে রীতিমতো কৌতুকপ্রদ নজির হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আমরা এখন সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার দিন পালন করি ইংরেজ আমলের বিধিবদ্ধ নিয়ম থেকে। কিন্তু ত্রিপুরার সরকারি অফিস আদালত বিদ্যালয় প্রভৃতিতে মহারাজা বীরচন্দ্রের

জন্মবার অনুসারে বুধবারেই সাপ্তাহিক বন্ধ পালন করা হতো। এ সম্পর্কে সরকারি দলিলে যা উল্লেখ করা আছে তা এইরকমঃ

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরা সরকারী বাংলা, ত্রিপুরা সরকার, ১৮৩ পৃঃ)

নিদর্শন-৯

মহারাজ বীরচন্দ্রের জন্মবার অর্থাৎ প্রতি বুধবার সরকারী আফিস ও বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকার সম্বন্ধে।

মেমো নং ২৫২ সেহা

রাজগীস্থ আদালত আর অফিসে এবং স্কুল ও পাঠশালাসমূহে প্রতি রবিবার বন্ধ থাকার বিষয় যে বর্তমান সময়ে নিয়ম প্রচলন আছে তাহা পরিবর্তন করিয়া শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের জন্মদিন অর্থাৎ প্রতি বুধবার বন্ধ দেওয়ার বিষয় প্রত্যেক আদালতের বিচারপতি ও আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধানতম কার্যকারকের মত গ্রহণ মানসে অত্র আফিস হইতে বিগত ১লা পৌষ তারিখে এক প্রসিডিং প্রচারিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত যে সকল মত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে সকলেই উক্ত প্রসিডিং এর লিখিত বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন। মহামান্য খাস আপীল হইতে অধস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী পর্যন্ত প্রত্যেক আদালতের বিচারপতি এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধানতম কার্যকারক ও অত্রত্য মফঃস্বলের অধিকাংশ আফিসাতের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের মন্তব্য আগত হইয়াছে। অতএব

হুকুম হইল যে—

প্রতি রবিবার বন্ধের নিয়ম রহিত করিয়া শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বাহাদুরের জন্মদিন অর্থাৎ প্রতি বুধবার বন্ধের নিয়ম অবধারণ করা যায়। অবগতি ও কার্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর ১খণ্ড প্রতিলিপি মহামান্য খাস আপীল আদালতের বিচারপতি সমীপে পাঠান যায়। ইতি

Mohini Mohon Bardhan
মন্ত্রী

ত্রিপুরাতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেই (১৮৮৮ খ্রীঃ) পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে হাল চাষের প্রথা প্রবর্তন করে যে রাজ আদেশ প্রচারিত হয় তা নিম্নে দেয়া হলো (উৎস ঃ তদেব- ১৮৩ পৃঃ হইতে ১৮৫ পৃঃ)।

পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে হালচাষের প্রথা প্রবর্তন সম্বন্ধে বিধান

মেমো
কুমিল্লা মন্ত্রী অফিস

পার্বত্য অধিকাংশ প্রজাগণ গো-মহিষ দ্বারা রীতিমতো হাল চাষ করতঃ ধান্য উৎপাদন না করিয়া তাহাদের চিরন্তন অভ্যাস অনুসারে জুম কৃষি করিয়া থাকে। এই কৃষি কার্যে তাহাদের ধান্য ফসল প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে লাভ হয় না। অথচ উক্ত প্রজাগণ মধ্যে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদন প্রথা প্রবর্তিত না থাকায় আশু জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি আবাদ হইয়া রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। অতএব রাজ্যের উন্নতি সাধন ও প্রজার ভাবী মঙ্গল বাসনায় পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে রীতিমতে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদনের প্রথা প্রবর্তন করার জন্য নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১) ম্যাজিস্ট্রেট, ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ প্রত্যেক পাড়ায় পার্বত্য প্রজাগণের সঙ্গীদিগকে তলপ দিয়া আনাইয়া হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐ প্রণালীতে ধান্য উৎপাদনের উপদেশ করিবে।

২) প্রজাগণকে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদন কার্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবশ্যক হইলে পর্বতবাসী, বাঙালী কি অন্য জাতীয় প্রজামধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্তি ক্রমে ঐ প্রণালীতে চাষ আবাদ শিক্ষা দিতে হইবে।

৩) স্থল বিশেষে অবস্থা বিবেচনায় গো মহিষ এবং হাল চাষের সরঞ্জাম ক্রয় করার সহায়তা সরকার হইতে করিতে হইবে।

৪) যে স্থলে প্রজাগণকে ধান্য চাষের অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক বোধ হয় সে স্থলে কোন্ কোন্ প্রজাকে কত টাকা কিরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত ১ দফার লিখিত কার্যকারকগণ তাহাদের নামধাম পাঠাইয়া অত্রাফিসে রিপোর্ট করিবে।

৫) ১ দফার লিখিত কার্যকারকগণ তাহাদের নিজ ২ এলাকার মধ্যে ৪ দফার লিখিত অবস্থাপন্ন কোন ২ পাড়ায় কোন ২ প্রজাকে কি হিসাবে নিতান্ত ন্যূনকল্পে মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া আবশ্যক বিশেষ অনুসন্ধানক্রমে তদ্বিষয়ের অবস্থাঘটিত একটি সুবিস্তার রিপোর্ট যত সত্বরে হইতে পারে ঐ আফিসে প্রেরণ করিবে।

৬) পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ ৫ দফার বিধানমত রিপোর্ট লিখিয়া তাহাদের উপরস্থ ম্যাজিস্ট্রেট কি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যোগে এই আফিসে প্রেরণ করিবে।

৭) যে স্থলে অন্য উপায়ে কার্য হওয়ার উপায় না হয় সে স্থলে পার্বত্য প্রজাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শস্বরূপ সরকার পক্ষে খামার করার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

৮) এই মেমো প্রাপ্তির পর অগৌণে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া রিপোর্ট করা ১ দফার লিখিত কার্যকারকগণের কর্তব্য হইবে।

---

* মেমোর ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ নাই

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন
হুকুম হইল যে—

কার্যে পরিণত হওয়ার বাসনায় এই মেমোর এক ২ খন্ড নকল সদর ম্যাজিস্ট্রেট এবং কৈলাসহর, সোনামুড়া ও বিলোনীয়া সাবডিভিসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবুগণ সমীপে পাঠান যায়। তাহাদের কর্তব্য হইবে যে কার্যে পরিণতির জন্য ইহার এক ২ খন্ড প্রতিলিপি তাহাদের অধীনস্থ কার্পাস ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবুদিগের নিকট প্রেরণ করেন। ইতি সন ১২৯৮ ত্রিং তারিখ ১রা আষাঢ়।

Mohini Mohon Bardhan
মন্ত্রী

পুনঃ হুকুম হইল যে—

এই মেমোতে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ প্রতি যে ২ কার্যভার অর্পন করা হইয়াছে তাহারা তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করে কিনা দৃষ্টি রাখার জন্য এই মেমো নকল পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসে ও অবগতার্থে আরেক নকল শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান-ইন-চার্জ সমীপে পাঠান যায়। ইতি ১২৯৮ ত্রিং ১লা আষাঢ়।

Mohini Mohon Bardhan
মন্ত্রী

১) কৈলাসহর	সাবডিভিসনের	ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক
২) বিলোনীয়া	ঐ	ঐ
৩) সোনামুড়া	ঐ	ঐ

৪) শ্রীযুত রাধামোহন ঠাকুর সাহেব সদর ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে।

সবিনয় নিবেদন,

এই সম্বন্ধে যে মেমো পাঠান হইতেছে উহার ৩/৪ দফার বিধানে যে অর্থ সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ অর্থ সাহায্য শব্দে এককালীন দান বুঝিতে হইবে না। প্রজাগণকে তাহাদের অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত লঘু হারে সুদ দেওয়ার সর্তে টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করাই উক্ত বিধান দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বটে। এই বিষয় আপনার অধিনস্থ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবুকেও ডেমি অফিসিয়েল চিঠি দ্বারা জানাইয়া দিবেন। ইতি সন ১২৯৮ ত্রিং ১লা আষাঢ়।

Mohini Mohon Bardhan

মন্ত্রী

* উপরোক্ত মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি সহ এই পত্রটি পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেলকে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

ত্রিপুরাতে ১৯০৩ খ্রীঃ (১৩১৩ ত্রিং ১৭ই শ্রাবণ) আগরতলা কলেজ থেকে সিনিয়ার বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে সরকারী তথ্য রয়েছে;

আগরতলা কলেজ ঃ সিনিয়র বৃত্তি
নিদর্শন-১৩

শিক্ষা বিভাগ—

বৃত্তি বিতরণ—

১৩১৩ ত্রিং, তাং ১৭ই শ্রাবণ, নিদর্শন নির্দ্ধারণ নং ৩৭০। শ্রী উমেশ চন্দ্র দে ও ধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন আগরতলা কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে দুই বৎসর তরে সিনিয়র বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

P. C. Roy

ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা— ৩৩৮ পৃঃ ত্রিপুরা সরকার)

আগরতলা কলেজ অধ্যক্ষ নিয়োগের তথ্যটি নিম্নরূপ ঃ

নিদর্শন-১৮

আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ

শিক্ষা

নিয়োগ

১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ খ্রীঃ) তাং ৭ই শ্রাবণ, মেমো নং ৪ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল নাগ এম এ আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কার্যে উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে মাসিক মং ৩৫০, তিনশত পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন পাইবেন।

U. K Das
মন্ত্রী

(উৎস ঃ তদেব-৩৪২ পৃঃ)

এই কলেজ বর্তমান উমাকান্ত একাডেমীতে ছিল।

ত্রিপুরার মহারাজার শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগে কোন কোন অংশের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র এই অনুর্বর রাজ্য, যার বিশাল অংশ ঘন জঙ্গল, পাহাড়, টীলাভূমির অন্তর্গত, কেবলমাত্র চাক্‌লা রোশনাবাদ অঞ্চলই যে রাজ্যের অন্ন যোগাচ্ছে, সে রাজ্যের রাজা বিনা খরচে লোকশিক্ষার বিপুল আয়োজন করেছে দেখে অনেকেই এই উদ্যোগে সামিল হতে পারে নি। মহারাজা বলেন — হিন্দুদের বিদ্যা বিক্রী করা মহাপাতকের কাজ। রাজা হিসাবে প্রজাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদ্যাপ্রদান কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। দুষ্কৃতকারীরা আগরতলা কলেজ ও স্কুলগৃহে আগুন লাগিয়ে দিল। এ সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি নিচে দেওয়া হলো।

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা ঃ ৩৪০ পৃঃ নিদর্শন নং ১৫)

আগরতলা কলেজ ও স্কুল গৃহাদি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হওয়া সম্বন্ধে ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন

গত পরশু রাত্রিতে অত্রস্থ কলেজ ও স্কুল গৃহসমূহ মনুষ্যকর্তৃক অগ্নি সংযোগ হেতু ভস্মীভূত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি অপরাধীকে ধৃত করিতে অথবা তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে

এবং যে পুলিশ কর্মচারী নিপুণতার সহিত অনুসন্ধান দ্বারা আসামী ধৃত করিতে পারিবে, তাহাদিগকে সরকার হইতে মং ২৫০, আড়াইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। পুলিশ কর্মচারী ও সন্ধানকারী, উভয়ের মধ্যে পুরস্কারের টাকা সমভাগে বিভক্ত হইবে, ইতি সন ১৩১৩ ত্রিপুরা তারিখ ২৮শে কার্তিক।

A. Chaudhury
পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট

---

* রাজধানী আগরতলাস্থ পূর্বতন সরকারী কলেজ সম্পর্কে এই বিজ্ঞাপনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করিতেছে। এ জন্য ঘোষণাটিকে জনশিক্ষার অধ্যায়ভুক্ত কবা হইল।

ত্রিপুরা মহারাজের স্টেট গেজেটের অষ্টাবিংশ ভাগ বিশেষ সংখ্যার ৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ (১৯২৯ খ্রীঃ)-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কমলাসাগর থেকে বীরেন্দ্রনগর পর্যন্ত লাইট রেলওয়ে বসাবার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছিলেন এবং মার্টিন এ্যান্ড বার্ন কোম্পানির উপর এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। এই হুকুমনামায় বিজয়কুমার সেন দেওয়ান স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু তা কার্যে রূপায়িত হয় নি। (সূত্র ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট — ২৫৪ পঃ- ত্রিপুরা সরকার)

তখন রাজধানী আগরতলার সাথে রেল যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো বর্তমান বাংলাদেশের আখাউড়া রেলস্টেশন। বর্তমান বাংলাদেশের যে যে রেলস্টেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরার বর্তমান মহকুমাগুলির যোগাযোগ ছিলো, তা হলো ঃ

	ত্রিপুরার মহকুমা		বাংলাদেশের রেলস্টেশন
১)	ধর্মনগর	১)	জুড়ি
২)	কৈলাসহর	২)	স্যামশের নগর
৩)	কমলপুর	৩)	কুলতলী
৪)	খোয়াই	৪)	বাল্লা
৫)	আগরতলা	৫)	আখাউড়া
৬)	সোনামুড়া	৬)	নয়নপুর (প্রধানত)
৭)	কমলাসাগর (কালিবাড়ি)	৭)	কমলা সাগর
৮) ক.	সোনামুড়া	৮) ক.	শঙ্খচাইল
খ.	পাঁচড়া অঞ্চল	খ.	রাজাপুর
গ.	মতিনগর	গ.	ফকির হাট
ঘ.	সোনামুড়া	ঘ.	কুমিল্লা

৯) বিলোনীয়া ৯) লাকসাম ও ফেণী
১০) সাব্রুম ১০) চট্টগ্রাম

এ থেকে অনুমান করা অনুচিত হবে না যে ত্রিপুরার সমস্ত মহকুমাই বর্তমান বাংলাদেশের সাথে রেলপথে যুক্ত ছিলো। এই অঞ্চল মহারাজের চাক্‌লা-রোশনাবাদ তথা ত্রিপুরার প্রধান আয়ের উৎস অঞ্চলের সাথে যুক্ত হওয়াতে রাজ তহবিলে আর্থিক সঙ্কটের জন্য এ রাজ্যের রাজধানী ও মহকুমায় সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। ১৯৪৮ সালে বল্লভভাই প্যাটেলের শ্বেতপত্রে ত্রিপুরার রেল যোগাযোগের কোন প্রতিশ্রুতি না থাকায় এই বিষয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তৎকালীন 'সেবক' পত্রিকার সম্পাদক তথা আনন্দবাজার গ্রুপের সংবাদ প্রতিনিধি প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক অমিয় দেবরায়ের উদ্যোগে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই 'ত্রিপুরা স্টেট কমিউনিকেশন কমিটি' গঠিত হয়। প্রয়াত অমিয়দা তাঁর স্মৃতি থেকে আমায় এর সদস্যদের নাম যা বলেছিলেন তাঁরা হলেন — ১. সর্বশ্রী উমেশ লাল সিংহ (সভাপতি) ২. অমিয় দেবরায় (সম্পাদক)। অন্যান্য সদস্যরা হলেন ৩. অনিল চক্রবর্তী (আইনজীবী) ৪. মনোরঞ্জন সাহা ৫. অটলবিহারী সাহা (ব্যবসায়ী) ৬. চিত্ত দেব ৭. কানুলাল দাশগুপ্ত ৮. কালিপদ ব্যানার্জী (সাব্রুম), ৯. ডাঃ সুধীরেন্দ্র ঘোষ (কৈলাসহর) ১০. সুনীল দত্ত (কমলপুর) ১১. যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (খোয়াই) ১২. চিত্ত চন্দ প্রমুখ। এই বৈঠকে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরে তা সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে চতুর্থ প্রস্তাবটি ছিলো —

4] 'That Railway communication in Tripura must be set up and the Govt. of India is requested to take immediate steps in this respect without further delay.'

এই কমিটির পক্ষ থেকে তদানীন্তন সেক্রেটারি প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক অমিয় দেবরায় ৬ই জুলাই ১৯৫৩ ইং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতিকে আগ্রাতে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালীন নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন ঃ

'President All India Congress Committee, Agra, Communication in Tripura (.) Six lakh people suffering for want of Road, Rail, Post-Telegraph Communication (.) Pray discussion in meeting (.) Request two Commissions to be set up, one to inquire into past affairs and another to plan for the future. Important roads connecting all subdivisions must be completed by March 1954.

এরপর কমিটি ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোগ রক্ষা করে এই কাজ শীঘ্র আরম্ভ করার জন্য রাজ্যের আম জনতার দাবী পেশ করেন। এরই ফলে রাজ্যস্তরে এবং সর্বভারতীয় স্তরে পত্রিকাগুলি ত্রিপুরার যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতার উপর তথ্য প্রচারে মুখর

হয়ে ওঠে। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল, রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর, যোগাযোগ মন্ত্রী জগজীবনরাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ। এই উদ্যোগের দ্বিতীয় পর্বে কমিটি এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করে ত্রিপুরার যোগাযোগের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা সাত পাতার একটি ছোট্ট পুস্তিকার মাধ্যমে পার্লামেন্টের ৭১৫ জন প্রতিনিধির কাছে পাঠান। তখন ভারতের প্রথম লোকসভা বসেছে। সে সময়ের প্রতিনিধিরা এখনকার মতো ছিলেন না। কাজেই সহজেই তা লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশনের সময় আলোচনার ঝড় তোলে। এতে মুখ্য ভূমিকা নেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ যথা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ফিরোজ গান্ধী প্রমুখ। তার কিছুদিন আগে কমিটির সম্পাদক রেলমন্ত্রীকে বিস্তারিত তথ্য সহ যে চিঠি দেন, তার উত্তরে রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যে চিঠি পাঠান তা হলো ঃ

MINISTER FOR TRANSPORT & RAILWAYS : INDIA

New Delhi
August,19, 1953.

Dear Sir

Many thanks for your letter and telegram. I have asked the Transport and Railway Minister to give me more particulars regarding your transport difficulties and shall be writing to you later.

I do want to visit Tripura but it will perhaps be sometime later, as Parliament will be in session during September also.

Yours faithfully,
Sd/- Lal Bhadur

To
The Secretary
Tripura State Communication
Committee, Sevak Patrika Office,
Agartala, Tripura.

এরপর যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জগজীবনরাম আগরতলায় উমাকান্ত ময়দানে ১৪ই অক্টোবর ১৯৫৩ ইং প্রকাশ্য জনসভায় ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আসাম-আগরতলা রাস্তার উন্নয়নের জন্য সতের লক্ষ টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা করেন। এরপর আসেন ২২শে অক্টোবর ১৯৫৩ ইং, ভারতের সহকারী পরিবহন ও রেলমন্ত্রী শ্রী ও. ডি আলেগের্জুন। তিনি ভারত সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়ার সহ ত্রিপুরা সফর করেন। এই কমিটি এই প্রত্যন্ত প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সমস্ত রকমের সহযোগিতার

আশ্বাস দেন। এই 'স্টেট কমিউনিকেশন কমিটি' পূর্ণ উদ্যমে কাজ করার পর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যোগাযোগের দাবীতে আন্দোলন সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। ১৯৫৯ খ্রীঃ রেলের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পৃথকভাবে আবার 'রেল ইনিসিয়েশন' কমিটি গঠন করা হয়। এর যুক্ত আহ্বায়ক নিযুক্ত হন শ্রী সরোজকুমার চন্দ এবং শ্রী অমিয় দেবরায়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই কমিটির আহ্বানে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মাঠে নাগরিকদের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত মাননীয় স্বর্ণকমল রায়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী এবং স্বর্গীয় অমিয় দেবরায় রাজ্য প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লীতে যান রেল যোগাযোগ ত্বরান্বিত করতে। তাঁরা পন্থজী এবং জগজীবনরামজীর সহযোগিতা লাভে সমর্থ হন। সেই বছরই কলকলিঘাট থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করার জন্য বাজেটে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগলো এই পথ নির্মাণে। এরপর ১৯৬৪ খ্রীঃ ২২শে এপ্রিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ এই ১১ কিলোমিটার রেলপথের উদ্বোধন করেন ধর্মনগরে।

এরপর রেল নিয়ে আন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। রেল যোগাযোগ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই 'ত্রিপুরা স্টেট কমিউনিকেশান কমিটি' রেল নিয়ে আরো আন্দোলন চালিয়ে যেতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। এরপর রেল আন্দোলনের পুরোভাগে এসে পড়ে 'অল ত্রিপুরা মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন'। বর্তমান প্রাবন্ধিক এই সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হওয়ার পর অনুভব করে যে রেল যোগাযোগ রাজধানী আগরতলা পর্যন্ত বিস্তার সম্ভব না হলে এ রাজ্যে, যেখানে অধিবাসীরা আলপিন থেকে লোহার রড, খাদ্যদ্রব্যের প্রায় সবটুকু বহিঃরাজ্য থেকে আমদানীর উপর নির্ভরশীল, তাদের পরিবহনের খরচের বিরাট বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে। যার ফলে জিনিষপত্রের দাম কমে আসবে। সমিতির পক্ষ থেকে ১৪ই নভেম্বর ১৯৭৩ ইং পত্রাঙ্ক নং AGT/F-16/5929-31/73-তে তিনি ত্রিপুরার রেল পরিবহনের করুণ চিত্র তুলে ধরে তৎকালীন রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের কাছে এক বিস্তারিত পত্র দেন। রেলমন্ত্রী এ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। অনেক সমীক্ষক দল ত্রিপুরাতে আসে। কিন্তু এ প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক রূপ নেওয়াতে তা অর্থনৈতিক রূপ থেকে রাজনৈতিক স্তরে গিয়ে নানা তালবাহানা এবং রাজনৈতিক ডামাডোলের আবর্তে ঘুরতে থাকে। ১৩/১২/৭৬ ইং তারিখে আঞ্চলিক রাজ্য রেল উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে গৌহাটির মালিগাঁওতে। রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রাবন্ধিক তাতে উপস্থিত হন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ত্রিপুরার রেল যোগাযোগের অসহনীয় অবস্থা এবং মূল্যস্তরের ঊর্ধগামী চিত্র তুলে ধরে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগরতলা-ধর্মনগর রেল যোগাযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং রেলমন্ত্রকে প্রেরিত হয়। কিন্তু তা হিমঘরে পড়ে থাকে রাজনৈতিক কূটকৌশলের জন্য। তারপর ব্যবসায়ীরা রেল আন্দোলনের জন্য ৫/৮/১৯৭৭ ইং তারিখে এক ঐতিহাসিক মিছিলে সামিল হন রাজধানীতে। সভায় এই দাবীর সমর্থনে ছোট বড় সব রকমের ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হলো। ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং বিপুলভাবে গণসমর্থন লাভ করে। এদিকে সরকারী সমস্ত আশ্বাস

ময়লা কাগজে পরিণত তথা নিষ্ফলা প্রমাণিত হলে সরকারী রক্তচক্ষু, ভয়ভীতি ও প্রচণ্ড চাপকে উপেক্ষা করে সমিতি রেল সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট ৬ দফা দাবীর সমর্থনে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ইং ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দেয় এবং তাতে বিপুলভাবে সাফল্যলাভ করে। সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত দোকানপাট বন্ধ, এমনকি পানের দোকান পর্যন্ত খোলা ছিলো না। স্কুল,কলেজ, অফিস আদালত অচল। ট্রাক, বাস, রিক্সা, টেম্পো সবই প্রায় বন্ধ ছিলো। ব্যবসায়ী সমিতির এই বিপুল জনসমর্থনে রাজ্যের শাসকদলের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় একে ছিন্নভিন্ন করার জন্য। মীরজাফররাও এগিয়ে আসে। এই বন্ধ্‌কে কেন্দ্র করে এক মিথ্যা অভিযোগের অজুহাতে এই প্রাবন্ধিকের নামে আদালত থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারা অনুযায়ী জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আনা হয় ও পরবর্তীকালে প্রথম শ্রেণীর বিচার-বন্দী হিসেবে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। বর্তমান গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চের সিনিয়ার এডভোকেট শ্রী অপাংশু লোধের নেতৃত্বে ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের প্রায় সমস্ত এডভোকেট সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী তথা প্রাবন্ধিকের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। পরে অবশ্য এই রাজনৈতিক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহৃত হয় এবং জনসমর্থন হারিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে তৎকালীন শাসক দল গদিচ্যুত হয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সে সময়কার রাজ্যের সংবাদপত্রেই রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার স্থান ভিন্ন।

(দ্রষ্টব্য ঃ ১. দৈনিক সংবাদ- ৬ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ইং ২. দৈনিক সংবাদ- ১০/২/১৯৭৮ ইং থেকে ২৩/৪/৭৮ ইং, লেখকের ধারাবাহিক প্রবন্ধসমূহ)।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে স্বাধীনতার পর প্রথম চার বছর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো বিপর্যস্ত। মিশ্র অর্থনীতি সংক্রান্ত মূল প্রস্তাব তখনই গ্রহণ করা হয়েছিলো নেহেরুর ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে। এই আবেগপ্রবণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং পাশ্চাত্যচিন্তাভিত্তিক ধ্যান-ধারণা এবং আমাদের অর্থনৈতিক যোজনাগুলি দেশকে যে ঋণচক্রের ধাঁধার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রথম যোজনা চালু হলো ১৯৫১-৫২ সালে। ছিলো কৃষি-ভিত্তিক। সম্পূর্ণভাবে টেনিসি ভ্যালী অথরিটি (TVA) Tennessce Valley Authority-র মতো করে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন তৈরি হয়ে ভারতকে উপহার দিলো দামোদর, ময়ূরাক্ষী, ভাক্‌রা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বাঁধ পরিকল্পনা। দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো খাদ্যে। শুধু তাই-ই নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান, সিংহল, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে খাদ্যশস্য রপ্তানিও করলো। আমেরিকা প্রমাদ গুনলো, এভাবে ভারত যদি এগিয়ে যেতে থাকে তাহলে তাদের পশুখাদ্যেরও অযোগ্য, যা তারা ভাঙা জাহাজে আটলান্টিক মহাসাগর বা প্রশান্ত মহাসাগরে বিসর্জন দেয়, সেই খাদ্য এসব গরিব দেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার এই সমস্ত গরিব দেশে অনুদানের নামে পি. এল. ৪৮০ পাঠানো এবং গুপ্তচরবৃত্তি এই উভয় প্রকল্প খতম হয়ে যাবে। তখন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. জন গলব্রেথ ভারতে এলেন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হয়ে। তিনি তাঁর প্রখ্যাত ছাত্রদের সাহায্যে, যাঁরা ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের কলকাঠির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত ছিলেন — তাঁদের সাহায্যে উপযাচক হয়ে ভারতের

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভবিষ্যতের উপর বিখ্যাত সব স্থানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার ছলে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক থেকে মিশ্র অর্থনীতির পরিকল্পনায় পরিবর্তিত করানোর ষড়যন্ত্রে সফল হলেন। দ্বিতীয় যোজনায় ভারতে তৈরি হলো বিদেশী মূলধনে ইস্পাত কারখানা — যেমন, দুর্গাপুরে ব্রিটিশ মূলধনে, ভিলাইতে রাশিয়ার মূলধনে এবং রাউরকেল্লাতে জার্মান সহযোগিতায়। অর্থাৎ, যথাক্রমে ইন্দো-ব্রিটিশ, ইন্দো-রাশিয়া এবং ইন্দো-জার্মান প্রকল্পে ভারি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হলো। এর দৌলতে দেশ কৃষিভিত্তিক থেকে মিশ্র অর্থনীতির ফাঁদে পড়ে গেলো। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুখ থুবড়ে পড়ার মুখে গ্রামীণ কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়েও আত্মরক্ষা করা গেলো না। পরিকল্পনাগুলি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ঋণভারে ন্যুব্জ দেহে যে চলা আরম্ভ করলো, তা থেকে আর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলো না। অগ্রগতির কফিনে পেরেক ঠুকে পশ্চিমী দেশগুলি সাহায্যের ডালা খুলে ভারতকে ভিক্ষুকে পরিণত করলো। ঠিক যেমনভাবে, 'উদীয়মান সমৃদ্ধিমুখী মানুষকে রাজনৈতিক দলগুলি ক্যাডার তৈরি করে তাদের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য করে, ভিক্ষুকে পরিণত করে।' সে প্রসঙ্গ অন্যত্র। তবে এটা সর্বাংশে সত্য যে, যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়নের দিশারী হয়ে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যাত্রাপথে চলা আরম্ভ হয়েছিলো, সে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আমরা শতযোজন দূরে সরে গেছি। পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের উন্নয়নের মাত্রা অতি সুন্দরভাবে বোঝানো যায়, কিন্তু বাস্তবে ধনী হয়েছে আরও ধনী, দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পরেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের কথাটা তাঁর মনে বিশেষ করে দাগ কাটে। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে তিনি একটি কমিটিও গঠন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সচিবদের নিয়ে একটি বিশেষ তদারকি কমিটিও গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে আসামের ঘটনাবলীই তাঁকে এ সমস্ত পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বাস্তবে কোন অগ্রগতিই হয়নি। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ গঠন করা হলো এ অঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে নিয়ে যাদের আদর করে সাত বোনের রাজ্য 'সেভেন সিস্টার' বলা হয়। সেগুলি হলো — আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম। এই আঞ্চলিক কমিটির সাথে কেন্দ্রীয় সচিব কমিটির যোগাযোগ বড়ই ক্ষীণ হওয়াতে পরিষদ সভাপতি এল. পি. সিং-জী কয়েকটি বৈঠকে তাঁর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন নি। বস্তুত, জন্মলগ্নেই এই 'সাতবোন' কেন্দ্রে সর্বনাশা অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। পরিষদের বৈঠকে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যে সমস্ত আশ্বাসের ফুলঝুড়ি উপহার দেন, তার সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি বাস্তবে রূপায়িত হতো, তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদে প্রভূত সম্পদশালী এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের যে কোন অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো। এ সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে নিম্নোক্ত অতি মূল্যবান দলিল পেশ করেন ডি. ও. চিঠি মারফত ঃ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ

মহাশয়া,

১. ভারতের অবশিষ্টাংশের উন্নয়নের সাথে এই অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নকে নিশ্চিত করা এবং সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ গঠন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আরো অধিক অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতিসহ এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আপনি পর্ষদকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছিলেন।

২. পর্ষদ মোটামুটিভাবে তার কাজ আরম্ভ করেছে। কিন্তু আরম্ভেই পর্ষদ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা তার নিজের চেষ্টায় সমাধান করা সম্ভব নয়। সেই অসুবিধা হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপযুক্ত পরিবহন ও যোগাযোগের অসুবিধা। এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, এই মৌলিক উপকরণ ছাড়া শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। আপনারা যে অর্থ দিয়েছেন তা দিয়ে আমাদের আঞ্চলিক কর্মসূচী সহ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা যাবে বলে আমরা আশা রাখি। আমরা আকাশযান এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করেছি এবং আমাদের অনুরোধ বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ এলাকায় রেলওয়ে সম্প্রসারণের ব্যাপারে এ অঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারত সরকারকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বেশি পড়ছে। আমাদের সদস্যগণ যখনই তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের জবাব হলো এই যে, রেলওয়ে হলো একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং যেসব এলাকায় রেলওয়ে স্থাপন লাভজনক নয়, সে সকল এলাকায় রেলওয়ে লাইন বসানো হয় না। এই অঞ্চলে যদি আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকতো তার থেকে উৎপাদিত মালের পরিবহনের জন্য রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে উক্ত এলাকায় রেলওয়ে স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং বর্তমানে যেসব লাইন রয়েছে তার আধুনিকীকরণ বিষয়টি যুক্তিযুক্ত হতো বলে তাঁরা বলেন। শিল্প উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আমরা যখন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করি এবং তারা বলেন যে এখানে শিল্প স্থাপন করা হলে তা লাভজনক হবে না। কারণ, রেলওয়ে যোগাযোগ না থাকাতে পরিবহন খরচ অত্যধিক।

৩. বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদনে এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পদশালী। এই অঞ্চল, বিশেষতঃ এ দেশের কাগজের অভাব মেটাতে পারে। আমাদের দেশীয় তেলের উপর নির্ভর করে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প গড়ে তোলা যায়। এখানে এখনো অনাবিষ্কৃত প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। ফলোৎপাদনের জন্য এ অঞ্চল অত্যন্ত সম্পদশালী। এ অঞ্চলে সারা দেশের ফল, সবজি এবং ফুল যোগান দিয়ে তা বিদেশে রপ্তানিও করতে পারে। এটি স্বতঃসিদ্ধ যে এ অঞ্চলের

জন্য উন্নত ধরণের রেলওয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা না করা হলে, আমরা পুরোপুরিভাবে কৃষি কিংবা ফলজাত শিল্প গড়ে তুলতে পারবো না। বছরের পর বছর যুক্তি-তর্কের জাল বুনে আমাদের কাছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে আমরা অনুভব করি যে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ন্যায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পূর্বে রেলওয়ে লাইন স্থাপন করা দরকার।

৪. অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আমরা অধিক রেলওয়ে স্থাপনের জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করছি না। এ অঞ্চলের জনগণের মানসিকতা এবং তার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরাপত্তা কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, সে সম্পর্কে আপনারা ভালভাবে অবহিত আছেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের অধিকাংশ রেলওয়ে ও রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, উন্নত ধরণের রেলওয়ে ব্যবস্থা শুধু আমাদেরকে বহিঃ আক্রমণের প্রতিরোধে শক্তিশালী করে তুলবে না, অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধেও আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠবো।

৫. অধিকন্তু, আমাদের অঞ্চলের অনেক অংশ যোগাযোগ লাইনের সাথে পুরোপুরিভাবে যুক্ত নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ভারতের অন্যান্য অংশের জনগণের নিকট এ এলাকাগুলো এখনো অগম্য রয়েছে। আমরা যদি জাতীয় জীবনের সাথে এ অঞ্চলের জনগণের সংযোগসাধন করতে চাই, তাহলে সস্তায় যাত্রী চলাচল ও মাল পরিবহনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. এ সকল কারণে আমরা আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের বিরক্তি করছি। কিন্তু এই উক্ত অঞ্চলে উন্নত ধরণের রেলওয়ে স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা যার জন্য তারা পৃথকভাবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দাবী করে আসছে, তার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি। আমরা পুরোপুরি স্বীকার করি যে, রেলওয়ে স্থাপন একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং দেশও আর্থিক অসুবিধার ভেতর দিয়ে চলছে। কিন্তু আমরা যা চাই তাতে সম্প্রতি মাত্র কিছু অতিরিক্ত টাকা লাগবে। প্রধানত আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় বলছি। আমাদের এই আশ্বাস দেয়া হোক যে আমাদের আর ভুলে যাবেন না।

৭. আমাদের বাস্তব অনুরোধ নিম্নরূপ ঃ

ক. যেভাবে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্রত্যেকটি রাজ্য এবং অঞ্চলের রাজধানী আকাশযানের মাধ্যমে সংযোজিত হওয়া উচিত, আমরা অনুরোধ করবো যে, রেলওয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল সংযোজিত করার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক। আমরা আরো অনুরোধ করবো যে, এ ব্যাপারে সমীক্ষার কাজ এবং ত্রিপুরার ধর্মনগর

থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের কাজ সোজাসুজি আরম্ভ করা হোক।

খ. বিভিন্ন সময়ে আমাদের নিকট এ আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে বঙ্গাইগাঁও থেকে গৌহাটি পর্যন্ত প্রায় একশ মাইল অবধি ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হবে। এই সম্প্রসারণের পেছনে বিশেষ অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এতে সমগ্র অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র গৌহাটি সরাসরিভাবে বোম্বাই, কলকাতা এবং দিল্লীর সাথে যুক্ত হবে। আমরা অনুরোধ করি যে পূর্বের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হোক এবং রেলওয়ে লাইন স্থাপনের কাজ সত্বর আরম্ভ হোক।

গ. সর্বশেষে আমরা জানাই যে, এই অঞ্চলের বর্তমান অনগ্রসরতা, প্রচুর সম্পদ, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে যার উপর ভিত্তি করে সাধারণত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হয়, সেই নিয়ম সংশোধন করার জন্য আমরা রেল মন্ত্রকের নিকট অনুরোধ রাখছি। উন্নয়নের স্বার্থে এই সংশোধন প্রয়োজনীয় এবং কুড়ি বছর পর্যন্ত এই নতুন বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হোক। এই নতুন লাইন খোলার জন্য রেলওয়ে দপ্তরের যদি কোন অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে তা আমরা প্রথম পাঁচ বছর চালাতে পারবো কিনা সে অসুবিধা সম্পর্কেই আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করছি।

৮. ভারতের অবশিষ্ট অংশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হোক।

এ ব্যাপারে আপনি বিশেষ আগ্রহী। আমাদের রেলওয়ের দ্রুত উন্নতি সাধিত না হলে এ উন্নতি সম্ভব নয়। অতএব আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে আপনি আমাদের অনুরোধ মঞ্জুর করবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সদস্যদের পক্ষে — নতুন দিল্লী
স্বাঃ বি. কে. নেহেরু ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ইং।

সেদিনই, অর্থাৎ ১৩/৯/৭৩ ইং; নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এন. ই. সি-র একটি সভায় এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রীমতী গান্ধী এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তৎকালীন রেলমন্ত্রীও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ৫/১/৭৪ তারিখে একটি ডি. ও. চিঠিতে ত্রিপুরায় রাজ্যপালকে জানান যে ধর্মনগর-কুমারঘাট রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। মন্ত্রীর কাজকর্মের প্রতিশ্রুতি এবং তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১১/২/৭৪ ইং তারিখের ডি. ও. চিঠিতে বিরক্ত প্রকাশ করে পরিকল্পনা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীকে লেখেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে প্রয়োজন হলে একটি বিশেষ মানদণ্ড স্থির করতে হবে এবং স্বাভাবিক

লাভ-লোকসানের মানদণ্ড পরিত্যাগ করতে হবে। চিঠিটি নিচে দেয়া হলো ঃ

প্রধান মন্ত্রীর কার্যালায়
ভারত সরকার
নতুন দিল্লী
ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৭৪ইং

নং ২৭(১৫৪) ৭৪-পি. এম. এস

প্রিয় ডি. পি.

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে ১৩ই সেপ্টেম্বর আমাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিতহয়েছিলো। তখন তারা ঐ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আশু সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস ঐ সব অঞ্চলের যোগাযোগ ও যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়ার জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো সময়ে সময়ে রেল লাইন সম্প্রসারণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আমাকে বলা হয়েছিলো যে, যদিও কিছু প্রকল্পের সমীক্ষা চালানো হয়েছে, কিন্তু এগুলো লাভজনক বিবেচিত না হওয়ায় সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ বিশেষভাবে বঙ্গাইগাঁও-গৌহাটি রেল লাইনটি মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। এ লাইনটির জন্য ব্যাপক চাহিদাও রয়েছে এবং এ বিষয়টি সেখানকার মানুষের মনকে প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। এ লাইনটি এ অঞ্চলের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে। এ লাইন থেকে লাভ পাবার ব্যাপারেও অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এ অঞ্চলকে লভ্যাংশ দেবার দায় থেকে মুক্তি দেবার প্রকল্পটি পঞ্চম যোজনা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলে ক্ষতির প্রশ্ন থাকবে না। সুদূরব্যাপী দৃষ্টি নিয়ে আমাদের এই সমস্যাটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। সম্ভবত এ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

রেলওয়ে বোর্ড উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেছেন যে, যদি পর্ষদ এগুলোর জন্য প্রায় ৫০ কোটি টাকার সংস্থান করে তাহলে এটা এবং আরও তিনটি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়, কারণ পর্ষদের বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়।

অনুগ্রহ করে এ প্রস্তাবগুলো তাড়াতাড়ি খতিয়ে দেখবেন। আমি এ প্রস্তাবগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে চাই।

সশ্রদ্ধ
ভবদীয় —
স্বাক্ষর ইন্দিরা গান্ধী

শ্রী ডি. পি. ধর
পরিকল্পনা মন্ত্রী

নিউ দিল্লী।

প্রতিলিপি ঃ

১. শ্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিত
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তর,
নিউ দিল্লী।

২. শ্রী এল. এন. মিশ্র
রেলমন্ত্রী,
নিউ দিল্লী।

৪/৬/৭৬ ইং তারিখে এক ডি. ও. চিঠিতে এন. ই. সেক্রেটারী ও রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে রেলের পঞ্চম যোজনায় ধর্মনগর-কুমারঘাট রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অনুরোধ করে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা এইরকম ঃ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ

'রিকিন্টি'
মটিনগর

ডি. কে. ভট্টাচার্য
সেক্রেটারী
ডি. ও. নং আর এল ওয়াই/১-১/৭৪-এন. আর. সি

বিষয় ঃ ধর্মনগর-কুমারঘাট রেলপথ স্থাপন

প্রিয় শ্রী বেরী,

আপনার ৫ জানুয়ারী, '৭৪ তারিখের নং ৭৩/ডব্লু ৪/সি. এন. এল/ এন. এফ/ বি (১) চিঠির উত্তরে আমাদের চেয়ারম্যানের ১৪-২-৭৪ তারিখের ডি. ও. নং এন পি ডি, ৬/১৬/৭৩ চিঠির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রেল মন্ত্রকের বাজেট ভাষণ (১৯৭৪-৭৫ বাজেট) থেকে দেখা যায় যে বাজেট প্রস্তাবে ধর্মনগর-কুমারঘাট রেলপথ স্থাপনের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে একথাও উল্লিখিত আছে যে উক্ত রেলপথ স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদকে অনুরোধ করা হয়েছে। এন. এফ. রেলওয়ে থেকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনের সম্প্রসারণের জন্য

বাজেটে ২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু ধর্মনগর-কুমারঘাট রেলপথের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নি। উপরে উল্লিখিত আমাদের চেয়ারম্যানের চিঠিতে এ বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে যে অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলগুলির জন্য নির্দিষ্ট রাজ্য পরিকল্পনাগুলির বিভিন্ন প্রকল্পের পঞ্চম যোজনা ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলপথ স্থাপনের জন্য ঐ অর্থ থেকে অর্থ পাওয়া যাবে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়িত করার জন্য পঞ্চম যোজনায় যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি বলতে পারি তা খুবই অল্প। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে কেবল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সড়ক, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলি রূপায়ণের চাহিদা মেটানো যাবে। সে কারণে আমি অনুরোধ করি যে ধর্মনগর-কুমারঘাট রেলপথ স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন এবং পঞ্চম যোজনায় রেল বাজেটে তার সংস্থানও থাকবে।

শিগ্‌গির পর্ষদের যে পরবর্তী বৈঠক বসবে তাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বিষয়টি দেখার ব্যবস্থা করলে এবং বিষয়টির অবস্থা সম্পর্কে দ্রুত জানা গেলে আমি খুশি হবো।

আপনার ভবদীয়—
স্বাক্ষর ডি. কে ভট্টাচার্য

শ্রী এম. এন. বেরী
চেয়ারম্যান, রেলওয়ে বোর্ড
তথা ভারত সরকারের —
প্রধান সেক্রেটারী,
ভারত সরকার
রেলমন্ত্রক, 'রাজভবন' নিউ দিল্লী।
নং রেল/১-১/৭৪-এন. ই. সি।

তারিখ ঃ ৪মে, ১৯৭৪ইং
শিলং

প্রতিলিপি ঃ ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব, আগরতলা

অবগতির জন্য এবং সেই সঙ্গে কুমারঘাটে প্রস্তাবিত কাগজের কলের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং যে বছর থেকে উক্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হবার সম্ভাবনা তা অবিলম্বে জানানোর জন্য বলা হচ্ছে।

স্বাক্ষর ঃ সেক্রেটারী
উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ, শিলং।

এরপরই ত্রিপুরায় রেল লাইনের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গতি আসে। অপরদিকে রাজ্যের ব্যবসায়ী সমিতির আন্দোলনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তখন রাজ্যের পরিবহন ও উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ রেল সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রী ধীলনকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দ্বারস্থ হলে শ্রী বংশীলাল একটি চিঠি দিয়ে অগ্রগতির জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

চিঠির কপি

ডি ও নং এফ (১)/বি ডি বি/ডব্লিউ/৬৪/এল ভি আই এ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ভারত
নিউ দিল্লী, ১১০০০১

প্রিয় ভট্টাচার্য,

ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিবহন এবং জাহাজ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী জি. এস. ধীলনকে লিখিত আপনার চিঠি ডি. ও নং এন. এইচ. ৪৪ ১২ (২)-ট্র্যান্স/৭৬, তারিখ ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬ইং-এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২. সমগ্র রাস্তাটির সমীক্ষা করে বর্ডার রোডস-এর চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং চীফ ইঞ্জিনীয়ার (রোডস্ ড্রইং) রাস্তার অবস্থা ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তাটিকে যানবাহন চলাচলযোগ্য করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজ স্থির করেছেন। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী, রাস্তার বাঁক ও উঁচু-নিচু ইত্যাদি সহ রাস্তার সমতল অংশের উন্নয়নে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে. আগামী ৫/৬ বৎসর ধরে, প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা করে এই রাস্তার উন্নয়নে ব্যয়িত হবে। এখন পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে এবং আমার বিশ্বাস আছে যে একে উপযুক্ত আকারে নিয়ে আসা হবে।

শ্রদ্ধাসহ
ভবদীয়
স্বাক্ষর ঃ বংশীলাল

শ্রী কে ভট্টাচার্য
পরিবহন উন্নয়ন মন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি যে কেবলমাত্র সাটল্ কর্কের মতো একবার শিল্পোন্নয়ন দপ্তর, একবার রেল দপ্তর, আরেকবার প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রভৃতিতে চক্কর খেতে লাগলো, তা বলাই বাহুল্য। আসলে ভারতের রাজনীতি এবং দেশের উন্নয়নের রূপায়ণ নির্ধারিত হয় দিল্লীর লবির জোর থেকে। যে অঞ্চলের হিম্মত বেশি, এম. পি বেশি, সে অঞ্চলের প্রতি অবহেলা করা দিল্লীর মসনদের পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপুরার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে, এ রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হলে, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক লোকসান। তাদের অর্থনীতির এক বিশাল অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। এ রাজ্য কিভাবে সম্পূর্ণরূপে আমদানীর উপর বেঁচে আছে, তার তথ্য পরে বিস্তারিত দেওয়া হলো। ঐ অঞ্চলের এম. পি-রা দলে দলে ছিঁড়লেন বিভিন্ন মন্ত্রীর দপ্তরে লবি অনুযায়ী। ফলে নানা কৌশলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন যতটুকু সম্ভব দেরীর কোপানলেই পড়ে গেলো। ক্ষুব্ধ এন. ই. সি-র চেয়ারম্যান এল. পি. সিং-এর ২১/১০/৭৭ তারিখের ডি. ও. চিঠি থেকে তা পরিষ্কার হয়ে গেলো।

ডি. ও/আর. এ. ওয়াই/১-১/৭৪ এ. এইচ
অক্টোবর ২১, ১৯৭৭

প্রিয় ত্রিপাঠীজী,

ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত মিটারগেজ রেল লাইন তৈরি করার বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আপনার ৮ সেপ্টেম্বরের চিঠির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। রেলওয়ের অর্থাভাব হেতু আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে ওই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হতে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছে প্রধানমন্ত্রী লিখিত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ইং -এর চিঠিটির প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, চিঠির এক কপি রেলমন্ত্রকেও দেয়া হয়েছিলো। চিঠিতে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ে সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের পক্ষে কষ্টসাধ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। কেননা ওই পর্ষদকে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ খুব বেশী নয়।

(পত্রের একটি প্রতিলিপি এই সঙ্গে সংযোজিত হলো)।

উপরন্তু, এটা বলাও ঠিক হবে না যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ এ অঞ্চলে রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে কম গুরুত্ব আরোপ করছেন। এ সম্পর্কে দ্রুত ও যথাযথ রেল সম্প্রসারণের ব্যাপারে পর্ষদ দাবী জানিয়ে আসছে এবং এই অঞ্চলের ৭টি রেল প্রকল্পের সার্ভের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে পর্ষদ রাজী হয়েছে। বিষয়টি ১৯৭৪-এর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের

তৃতীয় বৈঠকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তখন পর্ষদ এ অঞ্চলের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য রেল সম্প্রসারণের ব্যয় রেলওয়েকে বহন করতে সর্বসম্মতভাবে চাপ দেন। কারণ, রেলওয়ে কেন্দ্রীয় বিষয়ের অন্তর্গত এবং পর্ষদের হাতে যে অর্থভাণ্ডার রয়েছে তা দিয়ে রাজ্য সরকারের কর্তব্য বিষয়াবলীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী প্রণয়নই কষ্টসাধ্য। এজন্য পর্ষদ যোজনা কমিশন ও রেলমন্ত্রককে পঞ্চম পরিকল্পনায় ধর্মনগর-কুমারঘাট রেল সম্প্রসারণ প্রকল্প হাতে নিতে অনুরোধ করেন।

১৯৭৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সচিব কমিটির এক বৈঠকে অনুরূপ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই কমিটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভে ও অনুসন্ধানের বিষয়টি পর্ষদের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার উপর এবং রেল স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অর্থাৎ রেল মন্ত্রকের বহনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দেশের কোথাও কোন পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নমূলক তহবিল থেকে রেল প্রকল্পের জন্য অর্থ দেয়া হয়েছে, এমন ঘটনা সম্পর্কে আমি অবহিত নই। কেবলমাত্র একটি বা দু'টি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগণ রেল সম্প্রসারণ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বহন করছেন। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি রেলের জন্য প্রয়োজনীয় জমির মূল্য দিতে রাজী হয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি রেল সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি জমি বিনামূল্যে দিতে রাজী হয়েছেন। পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের হাতে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়েছে, তা পর্ষদের উন্নয়নমূলক দায়িত্ব পালনের পক্ষেই যথেষ্ট নয়। এ জন্য অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দ যোজনা কমিশন অনুমোদন করেছেন। রেল লাইন স্থাপন ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি বৃহৎ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তি। এর একটিমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পর্ষদের আর্থিক সীমিত ক্ষমতায় সম্ভব নয়। উপরন্তু,সারাদেশে রেল সম্প্রসারণের ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য নিজ ব্যয়ে রেল সম্প্রসারণ করা রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব। এই অনগ্রসর অঞ্চলে ধর্মনগর-কুমারঘাট রেল প্রকল্প বা অন্য প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের পক্ষে সম্ভব নয় বা তার নিকট থেকে এ ব্যাপারে আশা করাও সমীচীন নয়।

ভবদীয়

স্বাক্ষর ঃ এল. পি. সিং

শ্রী কে. পি. ত্রিপাঠী
রেলমন্ত্রী,
নিউ দিল্লী।

ইরানের শাহের ভারত সফরের সময় আমাদের এক আষাঢ়ে গল্প শোনানো হয়েছিলো

যে ত্রিপুরায় ইরানের সহযোগিতায় একটি কাগজের কল স্থাপন করা হবে। তাতে আমাদের ভারত সরকার যেমন প্রলুব্ধ হয়েছিলো, তেমনি ত্রিপুরার মানুষও আশার আলো দেখেছিলো। কিন্তু তা যে নির্মম ঠাট্টা মাত্র, তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়নি। তবুও মাল এবং যাত্রী পরিবহনের সম্ভাবনা জড়িত এন. এফ. রেলওয়ে তাদের নির্ধারিত ছকে যে উন্নয়নের ছবি এঁকেছিলেন, ঐতিহাসিক রসিকতা হিসেবে তা দেয়া হলো দপ্তরের নথি থেকে।
(পৃঃ ৩৯, দ্রষ্টব্য)।

১৯২০সালে বা তার সমসাময়িক কালে ত্রিপুরার মহারাজার উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় লালু কর্তা, নন্দলাল কর্তা প্রমুখ কিছু বিদেশী গাড়ি রাজ্যে নিয়ে আসার ফলে রাজগণ্ডীর বাইরে রাজ্যে মোটর বাহনের দ্বারা যোগাযোগের একটি সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই সময়ে স্টেট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন জে. এন. ভাদুড়ি। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির প্রাক্কালে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর ২৪শে কার্তিক, ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ (১৯৪৭ ইং) যে বাণী প্রচারিত হয়, তাতেও রেল যোগাযোগের উল্লেখ রয়েছে (সূত্র ঃ ত্রিপুরার প্রজা আন্দোলন ঃ কিছু তথ্য, মণিময় দেববর্মা— দৈনিক সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারী,১৯৭৮ ইং)। তখন যাত্রী ও মাল পরিবহনের দায়িত্ব প্রথমে 'চাটার্ড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোং'-এর উপর ছিলো। পরবর্তী সময়ে এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি নানা কারণে উঠে গিয়ে নবরূপে 'নিউ মোটর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস' নামে আত্মপ্রকাশ করলো। এর উদ্যোক্তা ছিলেন দুর্জয় কর্তা। মৌলবি আব্দুল বারিক খান (গেদু মিঞা) ছিলেন তাঁর ওয়ার্কিং পার্টনার। প্রথমে তাঁর অফিস ছিলো সেন্ট্রাল রোডস্থ নবনির্মিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ভবনের পেছনের দালান, পুরোনো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস 'খোসমহল'-এ। পরে তা স্থানান্তরিত হয় মোটর স্ট্যান্ডের বর্তমান কার্তিক ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে। পরে কার্তিকবাবুও তাতে ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ওই অফিস থেকে তখন টিকিট কেটে আখাউড়া যেতে হতো। শোনা যায়, ভগবান শ্রী শ্রী রামঠাকুরও আখাউড়া যাত্রার প্রাক্কালে এই অফিসে বিশ্রাম করেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ১০ থেকে ১২ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০ ইং সময়কালে যুগান্তর অনুশীলন সমিতির শ্রীমণি বিশ্বাস মহাশয় দশখানা জিপ নিয়ে 'ত্রিপুরা মোটর কোম্পানি' নামে একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আরম্ভ করেন। তার অফিস ছিলো বর্তমান ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেসের সংলগ্ন সেন্ট্রাল রোডে। তখন অবশ্য গোপাল ঠাকুর একখানা জীপ নিয়ে আগরতলা-বিশালগড়-উদয়পুর রোডে যাতায়াত করতেন। তিনি ত্রিপুরার অন্যতম পুরোনো ড্রাইভার। তাঁর অফিস ছিলো বর্তমান টি. আর. টি. সি অফিসের একটু দূরে স্বর্গীয় মহেন্দ্র দেববর্মার বাড়ির কাছে। গেদু মিঞা জীবন আরম্ভ করেন রাজবাড়ির হাতির মাহুত হিসেবে। পরে মহারাজার গাড়ি ধোয়ানোর জন্য নিযুক্ত হন। বুদ্ধি ও কৌশলবলে রাজ সংস্পর্শে এসে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। শিবনগরের সুবিশাল মসজিদ তাঁরই অর্থানুকূল্যে স্থাপিত। তাঁর 'নিউ মোটর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস' এককভাবে সরকারি মাল পরিবহন এবং যাত্রী পরিবহনের

ইরানের শাহ্‌-র ভারত সফরকালে প্রস্তাবিত উন্নয়নের পরিকল্পিত কাঠামো

৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনাকালে	স্থান	নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন	কোন সাল নাগাদ এই প্রকল্প চালু হবে	সামগ্রীর নাম	মাল গ্রহণের ষ্টেশন	মাল প্রেরণের ষ্টেশন	বাৎসরিক পরিমাণ	মাল গ্রহণের ষ্টেশন	মাল প্রেরণের ষ্টেশন	বাৎসরিক পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাগজ কল প্রকল্প	উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত কুমারঘাট নিকটবর্তী কটিকয়ার	ধর্মনগর	১৯৮৩	যন্ত্রপাতি (৫ম ধর্মনগর পরিকল্পনা/৬ষ্ঠ পরিকল্পনা)	কলিকাতা	বোম্বাই					পরামর্শদাতাদের থেকে তথ্যাদির অপেক্ষাকরা হচ্ছে
				কয়লা (৭ম পরিকল্পনা)	ধর্মনগর	মার্ঘারিট	১,০০,০০০ মে.টন				
				লবণ	"	কোলিয়ান	৮,৫০০ ,,				
				চুণাপাথর	,,	ডাকসোয়াই (মেঘালয়)	৫৮,৫০০ ,,				
				লবন	,,	সুরাট	১১,৫০০ "				
				অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য	,,	বোম্বাই	২,০০০ ,,	কলিকাতা	ধর্মনগর	৩০,০০০ মে টন	
				ডাল				বোম্বাই	ধর্মনগর	৩৬,০০০ " "	
				কয়লা (৫ম পরিকল্পনা)	.	মার্ঘারিট	১,৪৮০০ ,,				
পাট কল প্রকল্প	আগরতলা শহরের প্রকল্প নিকটবর্তী বাধারঘাট, পশ্চিম ত্রিপুরা	ধর্মনগর	১৯৭৮	চট এবং বস্তা ৫মও ৭ম পরিকল্পনা)				কলিকাতা	,,	১০,০০০ মে.টন	

অনুমোদন পায় ১৯৫০ সালে। (সূত্র ঃ চিনিহা — সম্পাদক শ্রী প্রভাত রায়, ১ম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য-১৩৫৯ত্রিং (১৯৪৯ ইং) ককবরক শব্দ 'চিনিহা'-র বাংলা অর্থ 'আমার দেশ')। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যে আগ্রহী গবেষক ওই নির্দিষ্ট তারিখের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার সংখ্যায় প্রাবন্ধিকের ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রবন্ধ থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

তবে এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারী শ্রী বি. এস. রাঘবন এই প্রাবন্ধিককে রেল আন্দোলনে যে সহযোগিতা করেছিলেন তা ত্রিপুরাবাসী চিরকাল স্মরণ রাখবে। রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে তিনি নিঃশব্দে ত্রিপুরার সেবা করে গেছেন দিল্লীতে বসে। পাঠকবৃন্দের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁর একটি চিঠির ভাবানুবাদ দেয়া হলো।

ভাবানুবাদ

ভারত সরকার
রেল মন্ত্রক,
রেলওয়ে বোর্ড।

ডি. ও নং /এ. এম. ডি/মিস্-৭৭
নিউ দিল্লী-১০০০০১
৩০শে আগস্ট, ১৯৭৭ ইং

প্রিয় শ্রী সাহা,

আপনার চিঠির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। গতকাল বিকেলে চিঠিখানা পেয়েছি। আপনি ও ত্রিপুরার মানুষ আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে ত্রিপুরার জন্য আমার আন্তরিক মমতাবোধ রয়েছে এবং এই রাজ্যকে সাহায্য করার লক্ষ্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

আপনার প্রস্তাবগুলো আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছি এবং এগুলোকে কার্যকর করে তুলতে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা করে যাবো।

ভবদীয়
বি. এস. রাঘবন, আই. এ. এস
(এডিশন্যাল মেম্বার, ভিজিল্যান্স)

শ্রী মোহনলাল সাহা,
জেনারেল সেক্রেটারী, অল ত্রিপুরা মার্চেন্টস্
এসোসিয়েশন, আগরতলা— ৭৯৯০০১।

একথা আমরা সকলে জানি যে, ত্রিপুরা রাজ্য মূলতঃ আমদানীর উপর নির্ভরশীল। আলপিন থেকে ক্রেইন পর্যন্ত জনজীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়। এর বিস্তারিত তালিকা এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। তবে অতি

প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য দেয়া হলো আংশিকভাবে কেবলমাত্র ধারণার জন্য। যেমন ঃ

আমদানী দ্রব্যের নাম	রপ্তানি রাজ্যের নাম
১. ডাল	১. কানপুর, বেরিলি (উ. প্র.) শিলিগুড়ি, ভূপাল, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ, হাতরাস ইত্যাদি।
২. সরিষার তেল	২. ভরতপুর, আগ্রা, কানপুর ইত্যাদি।
৩. লবন	৩. জামনগর, পোরবন্দর, রাজগঞ্জ, কচ্ছের সামুদ্রিক বেলাভূমি অঞ্চল।
৪. মরিচ	৪. অন্ধ্র, পাঞ্জাব, বিহার, কোলকাতার সুন্দরবন অঞ্চল ইত্যাদি।
৫. চিনি, গুড়	৫. বেরিলি, কানপুর, হাতুয়া, উ. প্রদেশ ইত্যাদি।
৬. বাদামতেল	৬. বেরিলি, গুজরাট, পাঞ্জাব ইত্যাদি।
৭. মসলাপাতি	৭. প্রধানতঃ কোলকাতা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ ইত্যাদি
৮. বনস্পতি	৮. কোলকাতা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, পাঞ্জাব ইত্যাদি
৯. টিন, রড	৯. পূর্বে এর বিশাল বাজার ছিলো একমাত্র কোলকাতা। এখন গৌহাটি, শিলচর এর স্থান দখল করেছে।
১০. মোটর পার্টস	১০. প্রধানত দিল্লী, পাঞ্জাব ও কোলকাতা ইত্যাদি।
১১. চাউল	১১. প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ইত্যাদি।

জীবন যেখানে এত সমস্যাসঙ্কুল, প্রাণ বাঁচাবার প্রতিটি দ্রব্য ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানীর উপর চেয়ে থাকতে হয়, প্রায় দু'শ কিলোমিটারের ন্যূনতম রাস্তা ট্রাকে চড়ার পরেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য এরাজ্যে এসে পৌঁছোয় ধর্মনগরের রেলপ্রান্ত থেকে, সে রাজ্যের অধিবাসীরা

মূলতঃ শান্তিপ্রিয় এবং অতি সহনশীল না হলে এ রাজ্যে প্রতি মাসেই গণবিপ্লব হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। বরঞ্চ, এ রাজ্য ভিন্ন রাষ্ট্রের বিপ্লবের শিকার হয়েছে। ভ্রাতৃবন্ধনের বজ্র অটুট ডোরে বেঁধে গ্রহণ করেছে পার্শ্ববর্তী দেশের ভাই-বোনদের। সাক্ষী হয়ে রয়েছে এক নতুন রাষ্ট্রের জন্মের— মধ্যরাতের ষড়যন্ত্র থেকে প্রভাতের সোনালী আলো পর্যন্ত। এ নবজাতক রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। নিজের রাজ্যের সমসংখ্যক জনসংখ্যার ঠাঁই হয়েছে ত্রিপুরাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। আরও অনেক ইতিহাস আছে যা সবসময় খোলাখুলিভাবে বলা যায় না। প্রাবন্ধিক তখন রাজ্যের উপরাজ্যপালের সভাপতিত্বে এবং চিফ সেক্রেটারী আই. পি. গুপ্তার নেতৃত্বে যে সরকারী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়েছিলো, তার কার্যকরী কমিটির সদস্যভুক্ত ছিলেন। যোগাযোগ উপকমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রয়াত তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত। তিনি সর্বভারতীয় সংবাদপত্র এবং পি. টি. আই, ইউ. এন. আই-এর সদস্য ছিলেন। প্রাবন্ধিক সে কমিটির সদস্য হিসেবে বহু জরুরি কর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের প্রয়োজনে সময়মতো পরে তা প্রকাশ করা হবে দলিলপত্র সহ। ত্রিপুরার অর্থনীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অতিরিক্ত বোঝা সহ্য করেছে সহমর্মিতা এবং ঔদার্যের সাথে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধকালে অতিরিক্ত অর্থপ্রবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, বিকলাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হলো ত্রিপুরার স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা। ফলে আর্থিক বাজারে ধনরাশির চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ শেষে তা সঙ্কুচিত হলেও স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসেনি, সারা দেহে দাগ পড়ে গেছে। যেমন বৃদ্ধকালে দেহ ক্ষীণ হয়ে গেলে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায়, তেমনি বাংলাদেশ যুদ্ধ শেষে উদ্বাস্তুরা নিজের দেশে ফিরে গেছেন, কিন্তু এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে উদ্বাস্তু অর্থনীতি। অর্থাৎ বাংলাদেশ সীমানা প্রান্তে পাচার-বাণিজ্যের অবাধ ব্যবসা। সুস্থ সবল দেহের উপর স্থায়ী বিষফোঁড়া 'প্যারাসাইট-ইকনমি'। পাচার বাণিজ্য ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পেলো। টাকা উপার্জনের সহজ সরল পথ চলে গেলো অন্ধকার জগতে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলো তা সরাসরি। নির্বাচনের আসরে ঢুকে গেলো কালো টাকার প্রধান উৎস, এই পাচার-বাণিজ্যের ফুলে ফেঁপে ওঠা হঠাৎ বড়লোক ব্যবসায়ীবৃন্দ ও তাদের দালালরা। এক অংশ সরকারী কর্মচারী তার সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত হলো, অপর এক অংশ যারা তাদের ঘুষের কালো টাকা কোন কাজে লাগাতে পারছিলো না, তারাও বে-নামে নেমে গেলো আসরে। বনেদী ব্যবসায়ীরা সেই যে পিছু হটতে আরম্ভ করলো এই অসম প্রতিযোগিতার বাজারে, কোনভাবেই তারা আর কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (রাজত্বকাল- ১৮৩০ ইং-১৮৪৯ ইং) বর্তমান রাজধানীর রূপকার। তাঁর অভিষেক হয়েছিলো ১০ই মে ১৮৩০ ইং (১২৪০ ত্রিং) লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে। আগরতলা তখন ছিলো গভীর অরণ্য। লোকসংখ্যা ছিলো মাত্র ৮৭৫ জন। কৃষ্ণকিশোরের পর ঈশানচন্দ্রের রাজত্বকাল (১৮৪৯-১৮৬২ ইং)। ৩/৭/১৮৭১ ইং ত্রিপুরায় আগত প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ এ. ডব্লিউ. বি. পাওয়ারকে চেয়ারম্যান করে তিন বর্গমাইল এলাকা নিয়ে প্রথম পৌর এলাকা গঠন সম্পর্কিত তথ্য আগেই দেয়া হয়েছে।

১/১০/১৮৭৫ ইং বর্তমান কামান চৌমুহনী সংলগ্ন টেলিফোন অফিসের জায়গায় ত্রিপুরার প্রথম পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ ইং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ত্রিপুরায় আগমন অথবা ১৮৯০ ইং উমাকান্ত একাডেমীর স্থাপন এ রাজ্যের সকলের কাছেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ) মহারাজা বীরচন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী (উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরা-১৩৪ পৃঃ) বঙ্গভাষা ত্রিপুরার রাজভাষা হওয়াতে এ রাজ্যের রাজকার্য বাংলাভাষাতেই হতো। রাজকার্যে হিসাবপত্র ১লা বৈশাখ থেকেই আরম্ভ হতো। পূজা-পার্বণ সহকারে আরম্ভ হওয়ার সূত্রে 'হালখাতা মহরৎ' এ রাজ্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

ত্রিপুরায় আদিকাল থেকেই নববর্ষের উৎসব তথা গড়াই দেবতার পূজা হয়ে আসছে রাজকীয় সম্মানে। সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত কর্ণেল মহিম ঠাকুর (১৮৬৪ ইং -১৯২৩ ইং) মহারাজা রাধাকিশোরের এ. ডি. কং. পদে যোগ দেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে (যার ভূমিকা লিখেছেন বাংলা ভাষার দিকপাল শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়।) 'নববর্ষের স্মৃতি' প্রবন্ধে (মূল গ্রন্থে-২২৬ পৃঃ) এ পূজার তথা নববর্ষের মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। নববর্ষে ত্রিপুরার 'গড়াই' অর্থাৎ 'গৌরী' নামক দেবতা পূজিত হয়ে আসছেন প্রাচীনকাল থেকে। এই পূজাতে আমরা দেখতে পাই রাজার 'দর্পণ' এবং রানীর 'বক্ষবন্ধনী' পূজিত হয়ে থাকে। মহারাজার যাত্রার সময় এবং শুভ বিবাহাদিতে 'লামপ্রা' পূজা হয়ে থাকে। এই পূজা 'বিনাইগার' তথা বিনায়ক অর্থাৎ গণেশ ঠাকুরেরই পূজা। এই পূজায় শ্রীশ্রী ঈশ্বরীয় 'রিয়া' দেয়া হয়। এখনও এ প্রথা মামুলিভাবে পালন করা হয়। রাজকার্যের খাতা রাজার প্রেস 'মাণিক্য প্রেসে' ছাপা হতো। ব্যবসায়ীদের খাতা আসতো কোলকাতা থেকে। স্থানীয়ভাবেও কিছু কিছু বাইন্ডিং-এর কাজ হতো। এর মাঝে সকলের আগে আসে 'বর্মণ বাইন্ডিং ব্রাদার্স'-এর নাম। এই দোকান ছিলো সেন্ট্রাল রোডের আরম্ভের মুখে পূর্ব দিকে পাঁচ দরজা দালান, যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। রাজন্য যুগে হালখাতার সময় নতুন খাতা বিক্রেতাদের মধ্যে প্রথমেই আসে বর্মণ বাইন্ডিং, ব্যানার্জি ব্রাদার্স, চৌধুরী ব্রাদার্স, লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রভৃতি দোকানের নাম। পরের যুগে আরও যারা রয়েছে — সত্যনারায়ণ পেপার ডিপো, ব্যানার্জি কোং, গোপীনাথ এন্টারপ্রাইজ (প্রথমে ছিলো মেসার্স গোপাল সাহা) প্রভৃতি। রাজ্যের মানুষদের নিজের নিজের পরিচিত মহাজনদের গদিতে থাকতো ঢালাও নিমন্ত্রণ। খুচরা পাইকাররা হালখাতা করতে মহাজনের গদিতে আসতেন। পুরোনো হিসেব মিটিয়ে নতুন খাতায় জমা রেখে কাজ আরম্ভ করতেন। রাজবাড়িতেও এইদিন উৎসব পালিত হতো। প্রজারা রাজঋণ তথা জমির খাজনা মিটিয়ে দিয়ে এইদিন 'পুণ্যাই' করতেন। পয়লা বৈশাখ থেকে এক মাস ধরে ত্রিপুরার বিখ্যাত বৈশাখী মেলা বসতো প্রথমে বর্তমান খোশবাগানে অবস্থিত বীরেন্দ্র ক্লাবের খেলার মাঠে, পরে তা রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানান্তরিত হয় মহারাজের গারদখানা তথা বর্তমান মেলারমাঠে। রাতের দিকে রাজপরিবারের লোকজন এসে জিনিসপত্র কিনতেন। এ মেলা তখন ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিখ্যাত মেলা হিসেবে চিহ্নিত হতো। মেলাতে যে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি হতো না, মেলা

শেষ হয়ে গেলে রাজবাড়ি থেকে তা কিনে নেয়া হতো। ফলে বর্তমান বাংলাদেশ, কোলকাতা এবং আসাম থেকেও ব্যবসায়ীরা এই বিখ্যাত মেলায় অংশ নিতে আসতেন। এই মেলা এ রাজ্যের আদিবাসীদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলো। সারা বছরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাঁরা এই বৈশাখী মেলা থেকেই খরিদ করে নিতেন। মেলারমাঠে সরকারি ও বেসরকারি ঘরবাড়ি তৈরি আরম্ভ হলে এই মেলা রাজবাড়ির পিছনে আস্তাবল মাঠের পাশে ডিমসাগরের পারে স্থানান্তরিত হয়। পরে সর্বশেষ তা মহারাজগঞ্জ বাজারের খান্না বিল্ডিং ভাঙার পর এ অঞ্চল ভরাট করে পাকা ভিটি তৈরি আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত দুই বছর ওই অঞ্চলেই বসেছিলো। ১৯৫৬ থেকে এই মেলা স্থানাভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। 'হান্টার'স্ স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস্ অফ বেঙ্গল' বইয়ে এর উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। রাজধানীর প্রধান বাজার আগে বসতো মিউনিসিপ্যালিটি রোডে। ঘোষপট্টিতে তরকারি বাজার বসতো, চালের পাইকারি বাজার বসতো ব্যানার্জি ব্রাদার্সের সামনে। পরে তা আবার যায় খোশবাগান ও হকার্স কর্ণার-এর জায়গায়। তারপর আসে মহারাজগঞ্জ বাজারে। মহারাজা এখানে গম্বুজ দিয়ে ইতালীয়ান শৈলীতে গোলাকৃতি করে তৈরি করিয়েছিলেন গোলবাজার। কালক্রমে তা ভেঙে গেলে আবার নতুন বাজার তৈরি হয় এবং তৎকালীন খাদ্য ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না তার উদ্বোধন করেন বলে এই বাজারের কিছু অংশ এখনো খান্না বিল্ডিং নামে পরিচিত। তখন রাজার তৈরি দালান ভিটি ব্যবসায়ীরা না নেওয়াতে বর্তমান গুড়পট্টির বিশাল অংশ জুড়ে এম. বি. বি. কলেজের ২নং ছাত্রাবাস হিসেবে এই ঘরগুলি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানের গোপাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পেছনের দিকের বিশাল অংশ জুড়ে দিঘি ছিলো। এখনকার জওহর ব্রীজের অঞ্চল থেকে পুরোনো রামঠাকুর কলেজ/স্কুলের সামনে বাংলাদেশের বড় নৌকো হাওড়া নদী ধরে ত্রিপুরাতে আসতো, বিশেষ করে বৈশাখী মেলার সময়। সেখান থেকে জিনিসপত্র মাথায় বোঝা হয়ে ব্যবসায়ীদের গুদামে যেতো। জগহরিমুড়া থেকে বর্তমান গাঙ্গাইল রোডের দক্ষিণ পাশেই ছিলো হাওড়া নদীর অবস্থান। বর্তমান টাউন প্রতাপগড় অঞ্চল পুরোটাই ছিলো প্রথমে নদী। পরে চর পড়তে পড়তে বিশাল ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত হয়। জেলাশাসক রাম্মুনির আমলে দ্বিতীয়বার আগরতলা বন্যা কবলিত হয়ে বিধ্বস্ত হলে তিনি আগরতলা শহরকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান স্থানে বাঁধ নির্মাণ করান শহর ঘিরে।

কলেজটিলা অঞ্চল ছিলো ঘোর জঙ্গল। সন্ধ্যা হলেই মানুষ হাতি নামার ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যেতো। এই শহরের উপান্তে ছিলো আগরতলার পিকনিক স্পট। মহারানীর লেইকের ঝুলন্ত পুলের ধারে অথবা লিচুবাগান বা কুঞ্জবন — এগুলো ছিলো রাজধানীর খুব প্রিয় বনভোজনের জায়গা। ত্রিশ বছর আগেও রেডিও শোনার জন্য এক একটি এলাকায় মানুষ পাড়ার দু'/একটি বাড়িতে ভিড় করতো। শনি-রবিবারের অনুরোধের আসর তো অবশ্যই শুনতে হবে, না হলে সারা সপ্তাহ কোন্ শিল্পী কত ভালো গেয়েছে তা নিয়ে মিষ্টি ঝগড়া বা বাজি জেতার টাকা নিয়ে পাড়াসুদ্ধ মিষ্টি খাওয়া চলবে কি করে? মহালয়া এলে রেডিও কেনার ভিড় বা পুরোনো রেডিও মেরামত করার সে কী ধুম! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া শোনার জন্য

সবাই এতই উদগ্রীব থাকতো যে কেউ কেউ আবার অতি উৎসাহে রেডিওর সামনে মাইক লাগিয়ে পাড়া চুক্তি শুনিয়ে দিতো, যেন দুর্গা পূজার উৎসব লেগে যেতো। মালঞ্চ নিবাসের ফুলবাগান থেকে ভোররাতে ফুল চুরি করতে এসে পরী দেখে অজ্ঞান হয়ে যেতো কিশোর। বুদ্ধ পূর্ণিমায় লাইন ধরে বুদ্ধমন্দিরে যাওয়া আর লিচুবাগানের লিচু চুরি করে খেতে খেতে আসা, এ ছিলো আমাদের ছোটবেলার, মানে পঞ্চাশ দশকের শেষভাগের সুখস্মৃতি।

আরও আগের কথা। আগরতলায় ছিলো না কোন টিউবওয়েল। প্রজারা খাবার জল ঘরে নিতেন রাজবাড়ির দিঘি থেকে অথবা রিজার্ভ পুকুর থেকে। দিঘির চার কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতো রাজপ্রহরী। তার দাঁড়ানোর সেই ভগ্নস্থান এখন অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য নীরবে বহন করছে। এখনকার জি. বি. হাসপাতাল এলাকায় কাঁঠাল বন আর নাগেশ্বর ফুলের বন ছিলো ঘন অরণ্যের মতো। কৃষ্ণনগরের পথের দুইধারে কৃষ্ণচূড়ার বিশাল বিশাল বৃক্ষ পথিককে ছায়া দিতো। কাঁটা নাগেশ্বর ফুলের সৌরভে আমোদিত হতো পান্থজন। অনেককিছুর মতো এগুলোও আজ হারিয়ে গেছে। আমার যশোদামাসীকে (যশোদা দেববর্মা) হারাবার ব্যথা এখনো বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে, বিশেষ করে নববর্ষ আর পূজার দিনগুলিতে। হ্যাঁ, আমি সেই যশোদামাসীর কথাই বলছি, যিনি ছিলেন আমার মায়ের 'বৈনারি'। বাড়ি ছিলো রানীরবাজারের কাছে। যশোদামাসী তাঁর দুই ছেলে তারাপদ আর রামেশ্বরকে নিয়ে সংক্রান্তির সময় দু'দিন — সংক্রান্তি আর পয়লা বৈশাখ, আর পুজোর সময় মোট পাঁচদিন আমাদের সাথে এসে থাকতেন। তারাপদ আর রামেশ্বরের সঙ্গে ওই কয়েকটা দিন যে কিভাবে লহমায় উড়ে যেতো আমার, টেরই পেতাম না। পরে ভীষণ কষ্ট হতো। মাসী আসার সময় পিঠে ঝোলানো বাঁশের খাঁচায় তাঁর নিজের জুমের সুগন্ধি খাসার চাল আনতেন। সাথে থাকতো নিজের গাছের বিভিন্ন ফল বা তরকারি। নিজের হাতে মাসী তাদের নিজস্ব আদিবাসী পদ্ধতিতে যে মিষ্টান্ন বানাতেন তা আমাদের ঘরে পয়লা বৈশাখের পুজোয় নিবেদন করা হতো। সেই মিষ্টান্নের সুবাস যেন এখনো নাকে লেগে আছে। ১৯৮০ সালের পয়লা বৈশাখে মাসী শেষবার এসেছিলেন। তারপরেই জুনের দাঙ্গার সেই বীভৎসতা। মাসীরা এখনো আছেন কিনা জানি না। যদি থাকেন, কামনা করি যেখানেই থাকেন যেন সুখে থাকেন। প্রতিবছর এখনো সেদিনের মতোই শিউলি ফোটে আমাদের শিউলি গাছে, কিন্তু তারাপদরা আর সঙ্গে থাকে না, শিউলি ফুলে সাজি ভরার প্রতিযোগিতা আর হয় না। মুছে যাওয়া সেই অপূর্ব মায়াময় দিনগুলো আজও পিছু ডাকে বারবার।

পড়ে মুখ দিয়ে যাদের রক্ত ঝরছে, তাদের নাম ভাগ্যহত ভারতের আমজনতা।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব থেকে সরে গিয়ে মুসলিম লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের লক্ষ্যে সরাসরি সংগ্রামে নামার ডাক দিলো মুসলিম জাতিকে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ছিলো উদ্দিষ্ট দিন। আগেই ওইদিন ছুটি ঘোষিত হয়েছিলো। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি ময়দানে এক সমাবেশে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কোন বাধা আসবে না বলে জানান। ওইদিন থেকেই কোলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতা এক আতঙ্ক নগরীতে পরিণত হলো। মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বে দুই প্রধান দল — হিন্দু আর মুসলমানের বুকের ভিতরে ভেদ ও বৈষম্য এত গভীর শিকড় গাড়ে যে কোন কথার বা তত্ত্বের প্রলেপ আর তাদের মিলন সূত্র খুঁজে পেলো না। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান কি শহরে কি পল্লীতে, বরাবর পাশাপাশি বাস করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। ধর্মে মুসলমান হলেও এদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জনই জাত্যংশে ভারতীয় তথা বর্তমান হিন্দু জনগণেরই পূর্বপুরুষ অর্থাৎ এক কালে হিন্দুই ছিলো— একথা আজ তাদের কে বোঝাবে?

ত্রিপুরাকে আমরা গণতন্ত্রের তীর্থভূমি বলে জেনে এসেছি। রাষ্ট্রীয় জীবনের সীমারেখায় কেবল নয়, ধর্মীয় জীবনের মানদণ্ডেও এ রাজ্যের আমজনতা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। এ রাজ্যের পাহাড়তীর্থে কোটি থেকে এক কম, ঊনকোটি দেবতার বাস। শুধু তাই নয়, এখানে চোদ্দজন দেবতা একসাথে একই আসনে পূজিত হন। মাতা সতীর ছিন্ন অঙ্গ পতিত হয়ে ধন্য করেছে, সৃষ্টি করেছে আরেক তীর্থভূমি— প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী, উদয়পুরের মাতাবাড়ি। কথিত আছে, পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে পিতার যজ্ঞস্থলেই সতী দেহত্যাগ করলে পর ক্রোধের উন্মাদনায় কৈলাশপতি সতীর নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেন, ধরাধাম তখন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়। শ্রী বিষ্ণু তখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডিত করতে আরম্ভ করেন। এভাবে মোট একান্ন অংশে খণ্ডিত সতীর দেহ ধরাধামের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়ে সৃষ্টি করে একান্ন পীঠ। সতীর ডান পায়ের খণ্ডিত বুড়ো আঙুল পড়েই গড়ে উঠেছে তীর্থভূমি এই ত্রিপুরেশ্বরী মাতাবাড়ি, একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম আরাধ্যস্থান। চাকলা-রোশনাবাদের সুবর্ণ ফসলা উর্বর ভূমি অংশ আর এই পার্বত্য ত্রিপুরা সংযুক্তভাবে যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ছিলো আমাদের, তার প্রাণভোমরা ছিলো কিন্তু চাকলা-রোশনাবাদের আবাদভূমি। তার খাজনা থেকেই এ রাজ্যের রসদের যোগান আসতো। সারা ভারতের বহু গুণীজ্ঞানীজন এ রাজ্যে এসেছেন। বিশ্বকবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা তো বলাই বাহুল্য।

রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আমাদের উত্তরণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মকে গণতন্ত্রের শিক্ষাই দেয়া হয়নি। তাই আমাদের দেশের ভাগ্যে সুশৃঙ্খল জাতি গড়ে উঠে প্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই শিক্ষাবিহীন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের দেশের বরেণ্য এক শিক্ষক তথা, বিশ্ব বরেণ্য দার্শনিক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ অশনিসঙ্কেত দিয়ে বলেছেন, 'Democratisation

মহারাজা বীরবিক্রম ঃ স্বপ্নের স্বাধীনতা ও আজকের বাস্তব

"সেইদিনের অপেক্ষায় আমি বসে থাকবো। দেশ ততদিনে স্বাধীন হবে।... সেদিন সমাজে বঞ্চনা থাকবে না, শক্তিমানেরা দুর্বলদের শোষণ করে সম্পদ জমিয়ে তোলবার সুযোগ পাবে না। সেদিন একটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটলে সারা দেশ কেঁদে উঠবে, একটা শিশু শুকিয়ে মায়ের কোল থেকে ঝরে গেলে রাষ্ট্র টল্‌মল্‌ করবে। ভাববেন না আপনাকে একটা কাহিনী শোনালাম, স্বপ্নে দেখা কোন ছবি এঁকে তুললাম। কাহিনী নয়, এ স্বপ্নও নয়। সত্যই সে দিন আগত..." (কালো টাকা/শচীন সেনগুপ্ত)

১৯৪৮ সালের অতি জনপ্রিয় একটি নাটকের সংলাপ এটি। এ সংলাপে কেবল প্রেক্ষাগৃহই মুখর হয়ে উঠত না সেদিন, স্বাধীন ভারতের এক মনোরম স্বপ্নের ছবি দর্শকদের হৃদয়ে গেঁথে যেতো। বিশাল এ ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ও জটিল স্বাধীনতার সংগ্রামে এই স্বপ্ন ছিলো ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে অসংখ্য দেশপ্রেমিক ও শহিদের প্রেরণাস্বরূপ।

শেষকালে যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তা নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক, কিন্তু এ বিষয়ে আজ আর কোন বিতর্ক নেই যে, আজকের স্বাধীনতা, মুক্ত দেশ জাতির সেই স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার কোন স্বর্গই রচনা করতে পারেনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদুর পরাহত। বিদেশী দেনার দায়ে জাতি আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে বাঁধা পড়েছে যে এখন স্বাধীন ভারতে প্রতি দুই সেকেণ্ডে যে শিশুটি সূর্যের প্রথম আলো দেখে সেও তিনশত পঞ্চান্ন টাকা বিদেশী ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথম চোখ মেলেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। হিসেব জানে না সে অবোধ শিশু। কিন্তু এই বিদেশী ঋণের অক্টোপাশ থেকে সে মুক্তি পায় না অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত। ধনী-গরিব, আদরে-অনাদরে যেভাবেই যে শিশুই এদেশের মাটিতে জন্মাক না কেন, এ তাদের অদৃষ্টলিখন। এই বেড়াজালের গোলকধাঁধায় পাক খেতে খেতে আমাদের স্বাধীনতার সাতান্ন বছর পার হয়ে গেলো। ভাইয়ে ভাইয়ে অবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা, খণ্ডিত স্বদেশ, অসংখ্য শহিদের আত্ম বলিদান এবং লক্ষ কোটি ভারতবাসীর বুভুক্ষা ও অবর্ণনীয় কষ্টস্বীকারের পথ বেয়ে সে দিন যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম আজ তা মরীচিকা এবং বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে কালো টাকার পাহাড়, অন্যদিকে মৃত্যুযন্ত্রণার হাতছানি। এই দুইয়ের যাঁতাকলে আটকা

degrades every thing' অর্থাৎ (শিক্ষাবিহীন) গণতন্ত্রীকরণ সবকিছু অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই সতর্কবাণীও আমাদের সম্বিত ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

অন্যদিকে আমরা রাজা শব্দটির অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। রাজা কেবল রঞ্জন করেন না, তিনি রজোগুণের প্রতিমূর্তি। রজোগুণ মানেই গতি। তাই রাজাকেই বলে অগতির গতি। অর্থাৎ যা জড়ত্বের প্রতিবাদী তাই রজ। শিক্ষার আলোকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা খণ্ড এবং ক্ষুদ্র সীমারেখাকে অতিক্রম করে জাতির সামগ্রিক দৃষ্টি ও কল্যাণমুখী ভাবনার দিকে নিজের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে পারেন, তারাই জনসেবক হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন হন এবং সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রকৃত সাধনা সার্থক হয়। সাধারণ মানুষের ভূমি থেকে জননেতা তৈরি হয়ে দেশের হাল ধরেন। আজ আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিদের দিকে তাকালে এ সমস্ত কথাগুলো বড়ই অর্থহীন মনে হয়। কিন্তু তার চেয়েও নিরর্থক হয়ে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে আজকের গণচেতনা। সারা দেশের শাসকের, শোষক রূপের ভয়াল চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ইংরেজ শাসনকালে। আর সে সময়ের দেশব্যাপী গণচেতনা গণরোষে পরিণত হয়ে ব্রিটিশ সিংহাসনের ভিতই নড়বড় করে দিয়েছিলো, বাধ্য করেছিলো তাদের এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু আজ যখন স্বদেশী গণতন্ত্রে স্বদেশবাসী জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থপরতা এবং গণতহবিলের অবাধ লুণ্ঠনের সংবাদ প্রতিনিয়ত খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে, তখন বর্তমান পথভ্রষ্ট গণতন্ত্রের প্রতি ধিক্কার আসে।

রাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, 'King is not one who rules only but one who backons the way ahead' — 'যিনি কেবল রাজ্যশাসন করেন তিনি রাজা নন। রাজা বলতে তাঁকেই বোঝায়, যিনি ভাবীকালের জ্যোতির্ময় পথে এগিয়ে নিয়ে যান রাজ্যকে।' ত্রিপুরার শাসকদের মধ্যে মহারাজা বীরবিক্রম যে অন্যতম দূরদর্শী নৃপতি ছিলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আগরতলা শহর নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে রাজকর্ম পরিচালনা — সব কিছুতেই তাঁর ছাপ আজও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তার মূল্যায়ন মহারাজার জীবদ্দশাতে হয়নি এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আত্মদহনে তাঁর প্রাণ অকালে ঝরে যায়। এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহারাজের রাজ্য শাসনের স্বপ্নের একটা রূপ আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারি কুমিল্লায় প্রদত্ত তাঁর একটি অভিভাষণ থেকে। যা আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ ও ব্যথিত করে।

(উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরা সরকারী বাংলা- ৫৬ পৃঃ, তারিখ ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ। আগস্ট ১৯২৮ ইং।

ব্রিটিশ ত্রিপুরা, কুমিল্লা সহরে "আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া" প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের অভিভাষণ ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ।

আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলী

আপনাদিগের প্রদত্ত অভিনন্দনে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের যে ঔদার্য্য এবং সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহী সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই ক্ষণে, ব্যক্তিগতভাবে এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ-সম্প্রদায়-বিস্মৃত সম্মিলিত জনসাধারণ কর্তৃক আজ আমি অভ্যর্থিত এবং সে অভ্যর্থনা অকৃত্রিম উৎসাহেরই সার্থক সমাবেশ। একদিকে আমার নিকট এদৃশ্য চিরস্মরণীয়,— অপরদিকে বর্ত্তমান জগতের সমক্ষে ইহা প্রাচীন পন্থার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনজ্ঞাপকও বটে।

আমার মনে হয়, যেন একটা তাড়িত সঞ্চারিত অস্বস্তি এবং অশান্তির গুরুভারে ভারতীয় বায়ুমণ্ডল আজকাল অত্যধিকরূপে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা জানেন, বিভিন্ন গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিমিশ্রণে অকস্মাৎ একটা উদ্বেলিত ফেনপুঞ্জ সম্ভূত হয়; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের বিরুদ্ধতাবাদিতা-রূপ উন্মাদনার উপাদান এবং মতবাদের বৈষম্যরূপ প্রক্রিয়া হইতে এই ফেনিল উত্তেজনা প্রসূত হইয়াছে। আমার আশা এবং সর্বান্তকরণ প্রার্থনা,— এমন দিন অচিরে আসিবে, যখন এই দ্বন্দ্ব এবং কলহ শান্তিতে রূপান্তরিত হইবে এবং সেই প্রগাঢ় এবং প্রচুর শান্তির কোলে, বিদ্বেষ ভুলিয়া বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় উত্তরোত্তর স্ব স্ব উৎকর্ষসাধনে লিপ্ত হইবে।

আমি আজ সরলভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি আবহাওয়া আমার রাজ্যে সৃষ্টি করা — ইহাই আমার সর্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত— হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নাই, প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির সুনিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। আমি চাই, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকে এইটুকু উপলব্ধি করুক যে, ধর্ম কেবলমাত্র পন্থা বিশেষ— যাহার অনুসরণেই একমাত্র, সার্বজনিক গন্তব্য গৃহে আমরা বিশ্বপিতার পদপ্রান্তে উপনীত হইতে পারি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যিনি 'ফেজ' ব্যবহার করেন তিনি 'ফেজ'-ই এবং যিনি পাগড়ি ব্যবহার করেন তিনি পাগড়িতেই অনুরক্ত থাকুন; কিন্তু আমি চাই, প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভূতিতে

স্পন্দমান হউক যে, দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরণেই পর্য্যবসিত; এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মা সাম্য-মৈত্রীর অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা ও প্রণয়ের দাবি রাখে।

আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, আমার আদর্শের সাধনা যেদিন সার্থক হইবে, আমার আশা আছে, সেই পরম শুভদিনে, — যে সম্প্রদায়-বিচারের উপর বর্তমান মানববুদ্ধি আজ অর্থ আরোপ করিতেছে, সে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, ভাস্কর নবীনের বিমল প্রভায় তিরোহিত হইবে। সেদিন, হিন্দু অথবা মুসলমান আমার প্রিয় পাত্র— একথা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা ভিন্ন সম্পূর্ণ অর্থশূন্য প্রতিপন্ন হইবে। আজ আমি একজন রাজভক্ত হিন্দুর তত্ত্বাবধানে রাজ্যস্থ অপরাপর জাতিবর্ণের কল্যাণের ভার সমর্পণ করিতে পারিতেছি; — আমার সে কাঙ্ক্ষিত দিনে, আমার আদর্শ-বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেরা তৎপুর তত্ত্বাবধানে, সমভাবেই আমার রাজ্যস্থ হিন্দু প্রজার ভার আমি হৃষ্টচিত্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার তৎকাল পর্য্যন্ত শিক্ষাবিস্তার— একমাত্র শিক্ষাবিস্তার কার্য্যই যে আমাদের কর্তব্য ও প্রচেষ্টার কেন্দ্র হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে আপনাদিগের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

আধুনিক আড়ম্বর-বাহুল্যদুষ্ট মতবাদ ও পদ্ধতির নিখুঁত অনুসরণে পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে, কিন্তু যে শিক্ষার-প্রতীচ্যকে উৎকর্ষ সাধনে আংশিকরূপে শক্তিমান স্বীকার করিবার উদারতা আছে, প্রাচ্য আদর্শকে অধিকতর সম্পদশালী করিবার নিমিত্তই যে শিক্ষা আগুয়ান হইয়া প্রতীচ্যকে আলিঙ্গন করে, আমি আপনাদিগের সম্মুখে সেই সুশিক্ষারই আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছি। ইহা বলা হইয়াছে, " প্রাচী চিরদিনই প্রাচী এবং প্রতীচী চিরদিনই প্রতীচী।" কিন্তু আমার মত এই যে, পরিণামে একমাত্র সম্মিলিত প্রাচী-প্রতীচীই জয়শ্রীমণ্ডিত হইবে। যদিচ, আপনাদিগের প্রত্যেকেরই মত আমিও উপলব্ধি করি যে, ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি, প্রাচীনত্বের গৌরবে গরিষ্ঠ — বিজ্ঞান দর্শনের সম্পদে সম্পন্ন — ধর্মের ঔদার্য্যে মহিমান্বিত প্রাচীর অবিমিশ্র আদর্শ দ্বারাই সুদৃঢ়ভাবে রচিত হওয়া অবশ্য সঙ্গত।

মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে ভাবপ্রবণ অথবা স্বপ্নবিহারী মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি সেই শুভদিনেরই অপেক্ষা করিতেছি — যেদিন আমার এই স্বপ্নই সত্য হইবে — সুন্দর হইবে — সার্থক হইবে।

ক্যাম্প, কুমিল্লা,
৮/৫/১৩৩৮ ত্রিং

স্বাধীনতা দিবসের মাত্র এক সপ্তাহ আগে (আগস্ট, ১৯৪৭ইং) মহারাজা বীরবিক্রম প্রয়াত হন মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে। রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নাবালক মহারাজকুমার কিরীটবিক্রম কিশোর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবীকে রাজকীয় অভিভাবকত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। দুঃসহ বেদনাসিক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম ভারতীয়

স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো। এই উপলক্ষ্যে কাঞ্চনপ্রভাদেবী একটি ভাষণ প্রদান করেন। (উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন-৩১৫ পৃঃ)

স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষ্যে
'রিজেন্ট' শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়ার
বাণী —

আজ আমাদের রাজ্যে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান হইল। তাই ত্রিপুরা আজ অপ্রীতিকর হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ শাসনক্ষমতায় স্বাধীনতার নূতন পথে অগ্রসর। এই প্রাচীন রাজ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অশান্তির ইতিহাসের মধ্যে ইহাই প্রকট হইয়াছে যে আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। স্বাধীনতার ন্যায় বহুমূল্য উপহার আজ ভারত ও পাকিস্থানবাসীদের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। আজ তাই এই উপলক্ষে সবিশেষ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও সম্মানজনকভাবে স্মরণীয় করিয়া তোলা শুধু আমাদের উচিত নয় কর্ত্তব্যও বটে।

যদিও ভারতের নানা স্থানে সকলে এই বিশিষ্ট কালকে নানা উৎসবে আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমি আমার প্রজাবর্গসহ আজ পূর্ণ উৎসাহে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি না। কারণ আমাদের প্রাণের অধীশ্বর আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু আমার এই একমাত্র সান্ত্বনা যে আপনারা সকলে আমার এই শোকে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

কাজেই আজ আমার প্রতি যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র আপনাদের সহানুভূতি নহে, সক্রিয় সহযোগিতা আমি আশা করিতেছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, আমার নেতৃত্বে রাজ্যের কার্য্যভার পরিচালনার্থে একটি 'রাজপ্রতিনিধি শাসন পরিষদ' (Council of Regency) গঠিত হইয়াছে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুযায়ী আমি এখন হইতে আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কিরীটবিক্রম কিশোর দেববর্মা মাণিক্যবাহাদুরের পক্ষে 'রিজেন্ট' অথবা 'রাজপ্রতিনিধি' পদ গ্রহণ করিতেছি। আমার স্থির বিশ্বাস যে আমি আপনাদের পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য লাভে বঞ্চিত হইব না। আপনাদের শক্তির মধ্যে আমার ক্ষমতা। আপনাদের ভালবাসা ও অনুরক্তির উপরেই আমি ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করিতে পারিব বলিয়া আমি আশা রাখি।

স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার স্নেহভাজন প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য শাসন সংস্কার নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যকরী করা আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। যে শাসন সংস্কার ব্যবস্থা তিনি গত ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বযুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থায় কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। যদিও এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব দেশে আর্থিক অসঙ্গতি পূর্ণভাবে চলিতে থাকায় এতকাল শাসন সংস্কার সম্বন্ধে

অভিনিবেশ দান করা সম্ভবপর হয় নাই। এই নব শাসন সংস্কারের মূল ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বহু বিষয়ে নিয়োজিত থাকিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে আমার পুত্রতুল্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবৃন্দও কতিপয় পরিবর্তন উপস্থাপিত করায় সে সমস্ত বিষয় বিবেচনাধীন আছে। আমি আমার প্রজাবৃন্দের সহনশীলতায় ও অনুরক্তিতে নিজে সবিশেষ আনন্দিত। আমি আজ দৃঢ়ভাবে আপনাদিগকে আশ্বাস দিতে পারি যে গ্রাম্য প্রতিনিধি ভিত্তিতে যাহাতে সর্ব সম্প্রসারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপ্রতি আমার পূর্ণ দৃষ্টি থাকিবে। এই সংস্কার ব্যবস্থা যাহাতে অতি সত্বরতার সহিত নিষ্পাদিত হয় তজ্জন্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞগণের সহিত যথাসময়ে আলোচিত হইবে।

কিন্তু আমার এই আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ 'কাউন্সিল অব রিজেন্সি'-র পরামর্শ অনুযায়ী আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি— বর্ত্তমানে তিনজন বেসরকারী মন্ত্রী— দুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান মন্ত্রী পরিষদে নিয়োগ করা যাইবে। অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে যাহারা বিশিষ্ট প্রভাবশালী তাহাদের মধ্য হইতেই মন্ত্রীত্রয় মনোনীত হইবেন।

আর একটি বিশেষ বিষয়— রাজধানী আগরতলায় যাহাতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের প্রতি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কলেজের স্থান নির্ধারিত আছে, কেবলমাত্র সুবৃহৎ অট্টালিকাটি প্রায় সমাপ্তির পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কতিপয় বৎসর যাবত জনশিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। বর্তমানে নয়টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ইহার মধ্যে একটি কেবল বালিকাদের জন্য, ২৫টি মধ্য ইংরেজী ও ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজ্যমধ্যে ছড়াইয়া আছে। উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা অধিবাসীদের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হওয়ায় কালেজিক শিক্ষা পুনর্জ্জীবিত করিয়া সংশোধিত ব্যবস্থায় আনয়ন করা হইতেছে। সর্বপ্রসারী প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিয়া আমাদের শিক্ষাকে রাজ্য মধ্যে পূর্ণ করিতে ইহাই একমাত্র উপায়; অন্যথায় শিক্ষা পদ্ধতি বালুকার ইমারতের তুল্য হইবে। এই কারণেই আমি আমার উপদেষ্টাদের সহিত একমত হইয়া এখনই কলেজের ক্লাশ চালু করিবার নিমিত্ত উদগ্রীব হইয়াছি। এই ব্যবস্থায় ব্যয় বরাদ্দও বর্তমান বর্ষের বাজেটে ধরা হইয়াছে। আমি আনন্দ সহকারে আরও জ্ঞাপন করিতেছি যে কলেজের নিমিত্ত চাকলা-রোশনাবাদ তহবিল হইতে আমার স্বর্গতঃ স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা বিশেষ বৃত্তি হিসাবে দান করা যাইতেছে।

পরিশেষে— এই দুর্যোগ সময়ে, আমি আপনাদের সকলের শুভ কামনা করিতেছি এবং শ্রীশ্রী ভগবৎ পাদপদ্মে আমি সর্বদা আপনাদের সহিতই আন্তরিকভাবে শুভ প্রার্থনা করিতে রত থাকিব। ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৯শে শ্রাবণ।

শ্রীকাঞ্চনপ্রভা দেবী

মহারাণী রিজেন্ট অব ত্রিপুরা।

বহু দশক ধরে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে ত্রিপুরায় বসবাস করে আসছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। এই মহামিলনের ফলে এ রাজ্যে বর্তমান ঐতিহ্যময় মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

এদের সম্মিলিত প্রয়াসেই আধুনিক ত্রিপুরার উন্নয়নের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের এই শান্ত রাজ্যে উগ্র সশস্ত্রবাদ বিগত আশির দশক থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে ভয়ালরূপে। কোন সন্দেহই আজ আর নেই যে এর পেছনে প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে যাদের, তাদের আমরাই অতি শ্রদ্ধার সাথে জননেতার আসনে একদিন বসিয়েছিলাম। তিল তিল করে যে হিংস্র মনোভাবের বীজ এরা রোপন করে ভাইয়ের বুকে ভাইকে ছুরি বসাতে প্ররোচিত করছে রোজ, আজ তারই স্থায়ীফলস্বরূপ রূপ পাচ্ছে জাতি দাঙ্গা। আজ এই শান্ত সমাহিত জীবনের মাঝে দেখা দিয়েছে হাহাকার— নিহত, আহত, লাঞ্ছিত, আক্রান্ত, বাস্তুচ্যুত ও বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠীর বুকফাটা আর্তনাদ। সাধারণ মানুষ ভাবছেন আর কত রক্তগঙ্গা বওয়াতে হবে শান্তির ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অপেক্ষায়! আজকের এই অবস্থার সাথে ১৯৪৬ সালের অবস্থার কত মিল। জোর করে বিপথে পরিচালিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হলো। অথচ এই বঞ্চিত সাধারণ মানুষ চিরকালই শোষিতের মাঝে থেকে যায়। তাদের প্রভু বদল হয় নিত্য। বিভিন্ন পোষাক পরে এসে তাদের কত আশা-ভরসার স্বপ্ন দেখায়। সেসব সোনালী স্বপ্ন যে চিরকাল মরীচিকাই থেকে যাবে, সে কথা জেনেও তারা বারবার প্রতারিত হয়। আবার বিশ্বাস করে। ভোটের মহড়ায় সামিল হয়, গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না। নতুন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। আবার তারা প্রতারিত হয়। এই অভিশাপ থেকে বোধ করি আর মুক্তি নেই। দল হয়ত বা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর তাদের ভুল স্বীকার করে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি জনতার হারানো দিনগুলিকে আর ফিরিয়ে আনতে পারে না। অতীতের গভীর ক্ষতগুলোকে ভরে তুলতে পারে না। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় তাদের এই ভুল স্বীকারের কাহিনী। কিন্তু তা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া উচিত, আমাদের সে শিক্ষা হয় না। তাই আমাদের জীবনে ভুল পথেই বারবার পা বাড়ানো নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর তাকেই ভাগ্যলিখন বলে মেনে নিয়ে দুঃখ, দারিদ্র, বঞ্চনা, অবহেলা আর নির্যাতনের শিকার হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় আমজনতাকে। আর নির্বাচিত প্রভুরা বাস করেন আরাম-আয়েসে, এই বঞ্চিত মানুষগুলোর অস্থি-মজ্জার কাঠামোতে, শোষিত রক্তের মশলায় তৈরি সুরম্য অট্টালিকায়। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বেদনার্ত হৃদয়ে লিখেছেন ঃ

> "তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি
> স্বর্ণ-শস্য তব, জাহ্নবী বারি!
> জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী।
> এরা কী দেবে তোরে কিছু না কিছু না—
> মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে!"

ভালোবাসার কোন রূপ নেই। সে কল্পনার রূপের মাঝেই অরূপরতনকে খুঁজে বেড়ায়। এই খোঁজের মাঝেই ফলফুল-শস্যে পরিপূর্ণ দেশজননীর স্তন থেকে অমৃতসুধা পান করেন সাধক। এই সুধা তাঁর ধমনীতে তোলে ঝঙ্কার— শাশ্বতকাল ধরে কৃতজ্ঞ চিত্তের শ্রদ্ধা-নৈবেদ্য

সঙ্গীত রূপে নিবেদিত হয় দেশজননীর পদমূলে। প্রাণের একতারাতে সে সুর বাজে নিরবধিকাল। যেন তা মূর্ত হয় কবিগুরুর সৃষ্টিতে—

"জানিনে ত ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।"

প্রার্থনা করি, এই ধ্বনির ঝঙ্কার যেন চিরদিন অনুরণিত হয় আমাদের হৃদয়ের মাঝে।

হালখাতা ঃ সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য

ত্রিপুরা চিরকালই তার প্রাণের ঐশ্বর্য ঢেলে বন্দনা গান গেয়েছে— "এসো হে বৈশাখ , এসো এসো।" এর সাথে মিশে রয়েছে তার প্রাণের ঝর্ণাধারা, নবজীবনের অঙ্কুর, আনন্দের শিহরণ আর হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা।

ফাল্গুনের বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে যে আনন্দ আর সমারোহের আবির্ভাব হতো এ রাজ্যে, বৈশাখী মেলাতে তার ব্যাপ্তি ঘটতো জীবনমুখী সর্বস্তরে। ফাল্গুনের ফাগের দাগ মিশতে না মিশতেই চৈত পরবের আগমন বার্তা। তারপরই একমাস ধরে বৈশাখী মেলা। এ মেলা রাজ্যের কেবলমাত্র পসরা বিকিকিনির মেলা নয়, এ মেলা বন-বনান্তরের সহজ সরল মানুষগুলোর সাথে পূর্ববাংলার শ্যামল অঞ্চলের নদী-নালার কাদামাখা প্রাণের মিলন-মেলা। এখন যে জায়গাটাকে আমরা মেলারমাঠ বলে জানি, ঐখানেই বসতো এই মেলা। শোনা যায়, উত্তর-পূর্ব ভারতে নাকি এত বড় মেলা আর বসতো না কোথাও। আমার ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ পিতৃদেব তাঁর স্মৃতিচারণে কথা প্রসঙ্গে সেদিন বলেছিলেন, কী আনন্দই না হতো সেখানে। ব্যবসায়ীদের কোনও চিন্তা ছিলো না মালপত্র ফেরত নেয়ার। যা বিক্রী না হতো মেলাতে, চলে যেতো রাজমহলে। ন্যায্য মূল্যও পাওয়া যেতো। কাজেই তখন ব্যবসার বাতাবরণও ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। প্রতিযোগিতা ছিলো কে কত ভালো জিনিষ আনতে পারে মেলাতে।" এখনকার বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা মন কেড়ে নেয়া জিনিষপত্র নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসতেন এই উৎসবমুখর মেলাপ্রান্তরে।

জিনিষপত্র কিছু নিয়ে খিটিমিটি হলেই সর্বনাশ! রাজকর্মচারী এসে হাজির। শাস্তির বিধান ছিলো কড়া, তাই শাসনে থাকতো সবদিক। কী না পাওয়া যেতো সেখানে— ছোটদের জন্য পুতুল থেকে শুরু করে রাজবাড়ির জন্য হীরা-জহরত। রাজবাড়ির লোকেরা আসতেন একটু রাতে। মহারাজা মহারানীকে নিয়ে এসে মাঝেমাঝে মেলা ঘুরে দেখতেন, ব্যবসায়ীদের সাথে কুশল বিনিময় করতেন, পরিচিত হতেন। জাতি, উপজাতি — এরকম খোঁচা মারা কথা তখন ছিলো না, ছিলো এক অনুন্নত বনানী প্রান্তরের মহারাজার নদীমাতৃক দেশের সবুজ মাঠের মানুষগুলোকে নিজের রাজ্যে আতিথ্যে বরণের উৎসব, হৃদয় উজাড় করা প্রাণের

ঝর্ণাধারায় অবগাহন।

ত্রিপুরায় মহারাজারা অতীতে এই নববর্ষকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। দেবালয় থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত সব নতুন করে রঙ লাগিয়ে সাজানো হতো। ঐতিহ্যমণ্ডিত দরবার কক্ষে বিশেষ দরবার বসতো সেদিন। নতুন পোষাক পরে ঝলমলে হয়ে আসতেন সব রাজকর্মচারীরা। রাজ্যবাসী সাজতেন সাধ আর সাধ্য অনুযায়ী কেনা নববস্ত্রে। লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, শিববাড়ি, চৌদ্দদেবতা প্রমুখ সমস্ত ঠাকুরবাড়িতে পূজা হতো, দুর্গাবাড়িতে হতো হোম যজ্ঞ। আর সর্বত্র ব্যবসায়ীদের নতুন খাতায় টিকা পরাবার ভিড়। প্রতি ব্যবসায়ী দোকানে নতুন খাতার মহরৎ বা হালখাতা উৎসব। মাছ বাজারে প্রচণ্ড ভিড়। পছন্দসই মাছ হলেই থলি এগিয়ে ক্রেতা বলতেন, 'দাও'। এদিন কোন দর কষাকষি নেই। বছরের প্রথম দিন দাম নিয়ে দরাদরি করলেই সারা বছর নাকি এই খিটিমিটি লেগেই থাকে — এই সংস্কার মনের ভিতরে কাজ করতো সবার। বিক্রেতা চাইছেন তাড়াতাড়ি মাল বিক্রি করতে, একটু পরেই বাজারে ভাঁটা পড়লে মাল নিয়ে বসেই থাকতে হবে। খারাপ জিনিষও ক্রেতা নেবে না আবার দরদামও করবে না। সংস্কার তাই অন্তর্মুখী হয়ে মিলনমধুর আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সবাই আজ আনন্দে মেতেছে — নতুন বছর বরণের আনন্দ। এদিনের আনন্দই তো সারা বছরকে ভরিয়ে রাখবে সুখে-শান্তিতে। ভরে রাখবে আপনজনকে, সকলের সংসারকে সমৃদ্ধির তৃপ্তিতে। ঠাকুরবাড়ির শঙ্খ-ঘন্টার সাথে সাথে সকালবেলায় ব্যবসায়ীদের প্রতি ঘরে ঘরে নতুন খাতার মহরৎ। লাল শালু কাপড়ে মুড়ে তৈরি জাবেদা খাতা, খতিয়ান খাতা, টোকা খাতা, নাকফোঁড় খাতা, রেজিস্টার খাতা, বিল খাতা, সি এন খাতা, ডেইলী সীট, পাকা খাতা, কাঁচা ফর্দ— কত বিচিত্র সব নাম। প্রত্যেকে তাদের ব্যবসার পরম্পরায় ব্যবহার করা ঐতিহ্য অনুযায়ী এবং প্রয়োজনমাফিক খাতা কিনে নেন ৩০শে চৈত্রের মধ্যেই। এই নববর্ষের খাতা কেনার বেলায়ও কিন্তু কোনও রকম দরদাম চলবে না সেদিন। দোকানের কর্মচারীরা ক্রেতার পাশে পাশে ঘুরছেন। ফুটফরমাশ অনুযায়ী খাতাপত্র দিচ্ছেন। তারপর সরাসরি তা ফর্দ হয়ে সরকারবাবুর কাছে চলে যাচ্ছে। সরকারবাবু তা মিলিয়ে দেখে হিসেব কষে দিলেন ক্যাশ কাউন্টারে। তারপর প্যাকেট হয়ে নববর্ষের নতুন ক্যালেন্ডার সহ নতুন খাতা চলে এলো ক্রেতার হাতে। এ খাতা নগদ কেনার রেওয়াজ।

হালখাতার দিন ঠাকুরবাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে খাতা পুজো করে এসে ঘরে বসে টিকা পরানো, তারপর প্রণামী লেখা সমাপ্ত করা ঠিক দিনক্ষণ দেখে। লাল সিঁদুরে তিন বা পাঁচটি ফোঁটা। আবার কোম্পানির টাকা দিয়ে ছাপ মারা। অনেকের আবার ঐতিহ্য অনুযায়ী সংরক্ষিত পুরোনো রূপোর টাকা এ কাজে ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে। প্রতি বছর সিন্দুকের কোণা থেকে সযত্নে রাখা এই টাকা বের করা হয় এর টিকা লাগাতে। কাজ শেষ হলে আবার প্যাকেট মোড়া হয়ে পড়ে থাকে সারা বছর আবার পরের বছরের অপেক্ষায়। কাঁচা হলুদ দিয়ে লেখা হয়, 'নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ নমঃ।' প্রথমেই শ্রীহরি সহায়। তারপর অন্য লেখা। প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, মালিক বা অংশীদারদের নাম। বাংলা, ইংরেজী তারিখ,

কাজ অনুযায়ী খাতার নাম। তারপর ফুল, চন্দন, ধান, দুর্বা, তুলসী পাতা দিয়ে বরণ। সারাবছর এগুলো থাকে। বছর ফুরোলেই তো এই খাতার কাজ ফুরোয় না, আয়কর দপ্তর আর বিক্রয়কর বিভাগের জন্য আট বছর ধরে লাল শালু দিয়ে মুড়ে এগুলো থরে থরে সাজিয়ে রাখতে হয়। যে কোনদিন ডাক পড়তে পারে। সকালে পুজোর পর্ব সেরে দুপুরে ভালোমন্দ খাওয়ার আয়োজন ঘরে ঘরে। রাতের অনুষ্ঠানে অবশ্যই ব্যবসায়ীদের প্রতি ঘরেই মিষ্টি সহযোগে হালখাতা। আগে নিয়ম থাকতো সারা বছর যে যা ব্যবসা করুক না কেন, এদিন সব বাকি পরিশোধ করতেই হবে। টাকা জমা দিয়ে নতুন যে মাল আসবে তা নববর্ষের হিসেবে যাবে।

গ্রাহকদের সাথে ব্যবসায়ীদের এটা হলো বাৎসরিক মিলন উৎসব। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে মালকোঁচা হাতে ধরে, ছড়ি নিয়ে রাজবাড়ি বা বনেদী ঘরের লোকেরা আসতেন ব্যবসায়ীদের ঘরে। অতি ঘনিষ্ঠদের ঘরে কেউবা আবার পরিবার পরিজনসহও আসতেন। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান, গুদাম ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে রাখতেন চৈত্রমাসের শেষদিনের মধ্যে হালখাতার নবজীবনের উৎসবকে বরণ করার জন্য। দোকানের সব কর্মচারী, সরকার বাবু, দিনমজুর — সবাই পায় মালিকের থেকে নতুন ধুতি, জামাকাপড় যার যার সাধ্য অনুযায়ী। মিষ্টি মুখের পালা চলতো দোকানে দোকানে অনেক রাত পর্যন্ত। অনেকে আবার অধীর আগ্রহে একান্ত আপনজনদের জন্য অপেক্ষা করতেন গভীর রাত পর্যন্ত।

একবার আমার মনে পড়ে গভীর রাত পর্যন্ত বাবা বাড়িতে না ফেরাতে মা আমায় ঘুম থেকে উঠিয়ে দোকানে পাঠালেন বাবা কেন আসছেন না দেখতে। বাড়ির কাজের লোক প্রেমানন্দকে নিয়ে দোকানে গেলাম। গিয়ে দেখি বাবা অতি যত্ন করে দু'জনকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। পরে জানলাম এঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় বীরেন দা (বীরেন দত্ত) এবং দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এর আগে আসার সময় করতে পারেননি। বামফ্রন্ট কর্মচারী সমন্বয় কমিটির ঘরটি তখন নড়বড়ে ছিলো। তাদের বিশাল একটি মারফি রেডিও ছিলো। আমাদের দোকান ছিলো তখন সূর্য রোডে বর্ধনের দালান (এখন আগরতলা হোটেল)-এর নিচের তলার দুই দরজা। ওদের রেডিওটা আমাদের দোকানেই থাকতো রাতে। প্রতিদিন তাঁরা তা নিয়ে যেতেন, আবার রাতে রেখে যেতেন। সেসময় থেকেই তাদের সাথে বাবার একটা আপনজনের মতো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। এমনকি সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও সময়মতো বাবা ওঁদের জন্য দোকান খুলে দিতেন আবার বন্ধ করে দিতেন। এতে কিন্তু দিগ্বিজয়বাবুরা ভীষণ লজ্জাবোধ করতেন।

এভাবে প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর পরিজনদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতেন পয়লা বৈশাখে। শুধু অফিসবাবু বা পাইকাররা নন, আত্মীয়-পরিজনরা ছাড়া ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তারাও তাঁদের সদস্যদের ঘরে এসে কোলাকুলি করে যেতেন। এই পঞ্চাশ দশকে ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শ্রদ্ধেয় হরিপদ কর। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন ব্যবসায়ীরা তাঁকে। নিজের স্বার্থে ব্যবসায়ী সমিতিকে কখনো পরিচালিত করেননি, বা কোন সুযোগও গ্রহণ করেননি জীবনে, যা ব্যবসায়ীদের একটা অতিখ্যাত বদ দোষ। আমার বাবাকে তিনি দাদা বলে ডাকতেন। কামান চৌমুহনীতে ইলোরা স্টোর্সের ভিটিতে ছিলো তাঁর দোকানঘর। প্রতি

হালখাতাতেই তিনি আসতেন অন্যান্যদের নিয়ে আমাদের দোকানে।

বর্ষবরণ উৎসব কিন্তু ত্রিপুরার ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রথমে তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। বিরাট জলসা হতো রাজাদের ঘরে। জ্ঞানীগুণীজনেরা তাতে অংশগ্রহণ করতেন। পরে তা রাজপরিবারের শাখা-প্রশাখায় পল্লবায়িত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পালিত হতো। এখন রবীন্দ্র পরিষদসহ কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা সে ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। প্রতি বছরই এখানে যথাযোগ্য মর্যাদাব সাথে তা পালন করা হয়।

দরবার ক্লাবের মাঠ তথা বর্তমান চিলড্রেন্স পার্ক

দরবার ক্লাবের মাঠ নামটা এ কালের রাজধানীর অধিবাসীদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন লাগবে। কিন্তু চিলড্রেন্সপার্ক বললে একগাল হেসে বলবেন, সে আর বলতে? অথচ তা দরবার ক্লাবের মাঠেরই নবনামকরণ।

দরবার ক্লাবের মাঠ রাজধানী আগরতলার কেন্দ্রস্থলে রাজবাড়ির সাথেই রয়েছে। রাজধানী আগরতলার লোকসংখ্যার স্বল্পতার সাথে তখন তা বেশ মানানসই ছিলো। নানা সভা, বিভিন্ন সমিতির বৈঠকে সেই ক্লাবটি বেশ মশগুল হয়ে থাকতো। উত্তর-পূর্বদিকের পুকুরটি তখনও ছিলো। মাটি দিয়ে তার চারপাশ ভরাট করা হয়েছে। মাঠের উত্তর-পশ্চিমদিকে একটা মুলিবাঁশের তরজার ছানি, তরজার বেড়া আর পাকা ভিটের ঘরে ছিলো দরবার ক্লাব। সে সময় মহারাজা 'ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার্স' নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ফিনান্সিয়াল এডভাইজার কৃষ্ণকুমার দেববর্মণের জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় ডাঃ সতীশ দেববর্মণ, পূর্ব পাড়ার হরচন্দ্র দেববর্মণ, বংশীঠাকুরের পিতা ললিত দেববর্মণ প্রমুখ শ্রদ্ধেয়রা তার দেখাশোনা করতেন। এর মধ্যে খেলাধূলারও ব্যবস্থা ছিলো। খেলায় অংশগ্রহণকারী সিনিয়ার গ্রুপের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল গাঙ্গুলি, জরুল হক্, তাঁর ভাই নরুল হক্, উসমানগনি, সতীশ দেববর্মণ প্রভৃতিরা। আর জুনিয়ার গ্রুপের মধ্যে ছিলেন অনিল দেববর্মণ, বীরচন্দ্র দেববর্মণ, বাঁটুল সেন প্রভৃতিরা। ট্রেক ইভেন্টের সাথে সাঁতারও হতো ক্লাবের পুকুরে। ক্লাবের মাঠের উত্তর দিকের রাস্তাকে তখন শকুন্তলা রোড বলা হতো। এ সম্বন্ধে বেশ মজাদার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে ১২৮ পৃষ্ঠায় — "জগন্নাথ বাড়ির সামনের রাজপথের পাশে যে দুটি উঁচু মহীরুহ রয়েছে, তাতে রাজ্যের শকুনের বাসা ছিলো। আর পথচারীর অসুবিধাও ছিলো। আমরা কিন্তু তার থেকে অধুনা ঐ রাজপথের নামকরণ করেছি শকুন্তলা রোড। কবিগুরু শুনে পরিহাস করে বললেন, 'খুব সুন্দর আর যথার্থ নামকরণ হয়েছে রে। দুষ্মন্তের রাজঅন্তঃপুরে দুঃখিনী শকুন্তলা এবার চিরবন্দিনী হলেন— কণ্বমুনির আর চিন্তা রইলো না।" সোমেন্দ্র দেববর্মা (রেণু সাহেব) এক সময় (১৩১২ বঙ্গাব্দ) কবিগুরুর আগরতলায় আসার গল্প প্রসঙ্গে একথাগুলি জানালেন। লঘু পরিহাস কিন্তু অত্যন্ত উপভোগ্য হলো। এ রাজপথের পরিচয় এখনো শকুন্তলা

রোডই রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তখনকার (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ আজ থেকে ১০০ বৎসরেরও বেশীকাল আগের আগরতলার এক সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে ১৮ পৃষ্ঠায়) — "রেলস্টেশন মোগরা হইতে আগরতলা আসিবার একমাত্র পথ। নৌকায়, হাতির পিঠে অথবা পাল্কিতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। আখাউড়া রাস্তা কিংবা আখাউড়া স্টেশন তখন ছিল না। রাজধানীতে দুইটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রাস্তা। রাজবাড়ীর পশ্চিমের দীঘি তথা কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমপাড়বাহী শকুন্তলা রাস্তা। ইহাই বর্ত্তমান প্রাসাদ তোরণের সম্মুখ দিয়া দক্ষিণবাই। রাস্তার পূর্ব্বদিকে শ্রীপাট। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়কে দক্ষিণে রাখিয়া পুরাতন পুলের উপর দিয়া বাজারে পৌঁছে। এই রাস্তা পূর্ব দিকে পুরানো আগরতলার দিকে আর পশ্চিমবাহী মোগ্‌রার দিকে গিয়াছে। এরই আশেপাশে সরকারী কর্মচারী ও শহরের অন্যান্য বাসিন্দার বাস। রাজবাড়ীর পিছনের দিকে ছিল মণিপুরী পল্লী রাধানগর। স্থানের নাম রাধানগর এখনও আছে কিন্তু মণিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশিষ্টতা লোপ পাইয়াছে তাহাদের স্থানত্যাগে। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে আর একটি রাস্তা এই মণিপুরী পল্লীকে ভেদ করিয়া শ্যামল বনানীর মধ্যে সরীসৃপের মত পুরানো কুঞ্জবনে শেষ হইয়াছে। এই পথের আশেপাশে দূরে দূরে কয়েকটি কুটীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গেরুয়া প্রলেপে চারিদিকের শ্যামলিমার শোভা বাড়াইত। প্রকৃতির এই শ্যামশোভা আজ সভ্যতার ছাপে নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে।" উল্লিখিত শকুন্তলা রোডই ছিলো সমগ্র রাজ্যের অভিজাত রাস্তা। বড় বড় পাথর কুচি বিছানো সুন্দর রাস্তা। অন্যান্যগুলি বেশির ভাগই ছিলো মেঠো রাস্তা।

মহারাজা রাধাকিশোরের আমলে ঢেউ খেলানো নিচু প্রাচীর, ১৪-১৫ হাত পরপর বিছানো ছয় ফুট উঁচু গোল থামগুলোর মাথায় একটা করে লোহার শিকল ছিলো। ঐসব জায়গায় হাতি বাঁধা থাকতো। মাঝে মাঝে মা হাতি দুলকি চালে শুঁড় দোলাতো আর কলাগাছ খেতো। বাচ্চা হাতিরা মায়েদের সাথে থাকতো, কিছুক্ষণ কলাগাছ খেতো, তারপর আবার মায়ের দুধ খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। আমরা তখন খুব ছোট। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে, সঙ্গে বড় যিনি থাকতেন তাঁকে ধরে ধরে এ মজার দৃশ্য উপভোগ করতাম। ক্লাবঘরের অনতিদূরের জলা অঞ্চল জার্মানী পানায় ভর্তি থাকতো। আর এই পানার মাথায় মাথায় বেগুনী সাদা ফুলগুলি যে অপূর্ব মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি করতো, তার শোভা রাজধানীর পুরোনো বাসিন্দাদের স্মৃতিপটে আজও অমলিন রয়েছে।

সে সুন্দর ঐতিহ্যমণ্ডিত দরবার ক্লাব মহাকালের নিষ্পেষণে আজ অবলুপ্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরার চিফ কমিশনার ভিঃ নানজাপ্পার উদ্যোগে ক্লাবের সামনের জায়গাটি প্রস্তুত করে 'কমিউনিটি হল' তৈরি হলো, যেটা নাকি তখন প্রধানতঃ বক্তৃতামঞ্চ হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। দরবার ক্লাবের মাঠের নতুন নামকরণ হলো 'চিলড্রেন্স পার্ক'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর। তিনি এই মঞ্চেই বক্তৃতা

দিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। রাজ্যের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ডিসট্রিক্ট কালচারাল অফিসার অহীন্দ্র দেববর্মণের ভগ্নী তথা হিরণ ঠাকুরের ছোট মেয়ে অপর্ণা দেববর্মণ অপূর্ব সরোদ বাজিয়ে সভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এই একটি অনুষ্ঠানের আলোকে তৎকালীন ঠাকুর পরিবারের ব্যাপক সঙ্গীতচর্চার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। রাজকুমারী অমৃত কাউর অনুষ্ঠান শেষে সেই অপর্ণাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন।

এখন যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি রয়েছে, সেখানে একটি ছোট্ট এরোপ্লেন বসানো ছিলো। শোনা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী এরোপ্লেন ফেনীতে নেমে আটকা পড়ে। পরে তাকে সিঙ্গারবিল বিমানবন্দরে আনা হয়। এরপর তাকে আর অন্যত্র স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নি। মহারাজের আদেশে দর্শনীয় স্মৃতি হিসেবে বিমানটি এই শিশু উদ্যানের উত্তর-পূর্বকোণে বেদীর উপর বসানো হয়। কালক্রমে এই এক আসনের বিমানটিকে কলেজটিলা এম. বি. বি. কলেজে ওঠার মুখে রাস্তার ডানপাশে বসানো হয়। তখন এস্থানে ইনডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টের অধীনে রাজ্য সরকারী অফিস আর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় তাঁত বোনার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইতিহাসের অবক্ষয়ের পথে এ সবই হারিয়ে যায়। সব চিহ্ন নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে যায়। এই শিশু উদ্যানে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন খেলার সাজসরঞ্জাম— দোলনা, স্লিপার, বেঞ্চ ইত্যাদি বসানো হয়। শহরে আলোচনা সভার স্থল হিসেবে শকুন্তলা রোড সংলগ্ন স্থলে ঐ কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছিলো। অভ্যন্তরে রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পকলার ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা ছিলো। রাজ্য সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি দপ্তরের অফিসও ছিলো কিছুদিন সেখানে।

পরবর্তীকালে এই স্থানে মুক্তমঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছেন কামরাজ নাদার, বাবু জগজীবনরাম, শ্রীপদ অমৃত ডাংগে, জ্যোতি বসু, মোরারজী দেশাই, জর্জ ফার্নান্ডেজ, প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমূখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ সহ রাজ্যের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, হালের নেতারা বাদে। আগে এই মাঠেই আয়োজিত হতো রাজ্যেব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেলা, শিল্প মেলা, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি। এর সাথেই বসতো দোকান ঘর, যাত্রা, সার্কাসের আসর। নাগরদোলা সহ নানা মজাদার আনন্দের আয়োজন থাকতো ছোটদের জন্য। আবার মৎস্য শিকারীরাও এখানকার জলাশয়ে মাছ শিকার করে কম আনন্দ পেতেন না। এই ক্লাবঘরের জায়গাতেই মুক্তমঞ্চ তৈরি হয়েছিলো শহরবাসীর বিনোদনের জন্য। সেই মঞ্চে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো সুখময় সেনগুপ্তের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। সংবাদ সাহিত্য জগতের প্রবাদপ্রতিম স্বর্গীয় তুষারকান্তি ঘোষ সে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বাংলার সাহিত্য জগতের দিকপালরা এই রাজ্যে এসেছিলেন। পাঁচদিন ধরে সেখানে বাংলা সাহিত্য, ত্রিপুরার বাংলাভাষা চর্চা, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিলো, তা এখনো রাজ্যের পুরোনো বাসিন্দাদের স্মৃতিপটে মুক্তোর মতো দ্যুতিতে বিদ্যমান।

পরবর্তী সময়ে সে মুক্তমঞ্চ ভেঙে ফেলা হয়েছে। তৈরি হয়েছে চিলড্রেন্স পার্কের সেই জায়গা জুড়ে সুকান্ত একাডেমী। এই একাডেমীর সাথে সাহিত্যের কোনো যোগাযোগ নেই। জনশ্রুতি, এর নাম প্রথমে প্রস্তুতির সময় 'বিজ্ঞান মন্দির' রাখা ঠিক হয়েছিলো। পরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে কবি সুকান্তর নামে 'সুকান্ত একাডেমী' রাখা হয়। নামের এই পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রান্টের টাকা খরচেও ফ্যাকড়া বেঁধে কয়েক বছর এই সুকান্ত একাডেমী নির্মাণের কাজও নাকি বন্ধ হয়ে ছিলো। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, ত্রিপুরার ঐতিহ্যের প্রতীক দরবার ক্লাবের মাঠ আজ বারাঙ্গনাদের শেষ আশ্রয়স্থল, সংবাদপত্রে যার বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়।

উমাকান্ত একাডেমীর নানা রঙের দিনগুলি

এখনও প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় আখাউড়া রোড দিয়ে পদচারণা করতে করতে যখনই এ পথ অতিক্রম করি, ডানদিকে প্রথমেই পড়ে হাইকোর্ট, তারপর মন্ত্রী অফিস পার হতেই আমার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বিদ্যায়তন— চোখে পড়লেই আনচান করে ওঠে বুক। জ্বলজ্বল করে যেন দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছে 'উমাকান্ত একাডেমী' লেখা অক্ষরগুলো। এ সেই বিদ্যামন্দির যে—

"কণ্ঠে মোর দিল ভাষা বিদ্যামঠ, শুনাইল মোরে
দেশবিদেশের বাণী, মোর রিক্ত ঝুলিখানি ভরে,
পাথেয় সম্বল দিল, বারবার তারে নমস্কার।"
(বিদ্যালয় পথে — কালিদাস রায়)

তাঁকে আভূমি প্রণাম জানিয়েই আমার এই সামান্য কিছু কথার অবতারণা।

মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। অথচ মাঝে বেয়াল্লিশ বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গেছে। আমরা সবাই একাডেমীর রবীন্দ্র হলে সমবেত হয়েছি আমাদের নব নিযুক্ত প্রধান শিক্ষক শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত মহাশয়কে স্বাগত জানাতে, তাঁকে বরণ করে নিতে। তার সাথে আরও গর্বের ছিলো যে তিনি তখন রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত শিক্ষক। সম্ভবতঃ ত্রিপুরায় প্রথম। তারপর তাঁর রাজকীয় চেহারা দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসতো। 'উমাকান্ত একাডেমী' শব্দগুলি লিখেছিলেন প্রয়াত ধর্মনারায়ণদা (প্রখ্যাত চিত্রকর)। আর তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন স্কুলের ড্রইং টিচার প্রয়াত ননী স্যার। 'উমাকান্ত একাডেমী' অক্ষরগুলো মাথার উপর রেখে প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই যে লম্বা হলঘরটি, তার বেশ রাজকীয় চেহারা ছিলো। এই হলঘর বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। হলের ভেতর চারিদিকে বংশানুক্রমিক ত্রিপুরার মহারাজাদের দুর্লভ পূর্ণ অবয়বের তৈলচিত্র ছিলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এ হলে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিলো। তিনি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

সভার সভাপতির আসনে ছিলেন বিদায়ী প্রধান শিক্ষক অনিল দাশগুপ্ত মহাশয়।

প্রয়াত শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত মহোদয়ের সেদিনের ভাষণের কিছু অংশ আমার স্মৃতিতে আজও অটুট রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে সংবর্ধনা সভায় আমাকে তিন মিনিট সময় দেয়া হয়েছিলো ভাষণের জন্য। আমি তাতে বলেছি — মানুষের জন্মের সাথে সাথে দুইটি শক্তি তার মধ্যে বাসা বাঁধে। একটি দেবশক্তি, অপরটি দানব শক্তি। দানব যখন জেগে ওঠে, দেবতা তখন ঘুমিয়ে থাকে। আবার দেবশক্তি যখন জাগে, দানব শক্তি তখন ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের শিক্ষকের কর্তব্য হলো শিশুদের মনে, ছাত্রদের মনের ভিতরে যে দেবশিশু রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলা, ছাত্রদের পরিমিতভাবে সে অন্তরস্থিত দেবশিশুর আহার যোগানের সুযোগ করে দেয়া, শিক্ষার সে অমৃতত্ত্ব পরিবেশন করা, জ্ঞানামৃতের অনুসন্ধান দেয়া। দেবতার খাদ্য অমৃত। দানব পান করে বিষ। শিক্ষার স্থানে কোন ভেদ নয়, ঐক্যের বীজ বপন করা। এগুলিই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। আজকের দিনে তাঁর সেই অমূল্য কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে।

প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিয়ে শিতিকণ্ঠবাবু একাডেমির খোলনলচে পালটে দিলেন। স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের প্রতিটি শ্রেণী হিসেবে চারটি স্কোয়াডে ভাগ করে দিলেন। চারটি ছাত্রকে এদের সর্বাধিনায়ক করলেন। প্রতিটি ক্লাসে এই চার স্কোয়াডের ছাত্র ছিলো। ভারতমাতার চার বরেণ্য সন্তানের নাম অনুযায়ী এদের নাম ছিলো—১. তিলক স্কোয়াড, ২. অরবিন্দ স্কোয়াড, ৩. গান্ধী স্কোয়াড, ৪. রবীন্দ্র স্কোয়াড। আমরা যে চারজন এর দায়িত্বে ছিলাম, ১. প্রাণবল্লভ কান্তি রায়(পলিটেকনিকের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সি. পি. ডব্লিউ. ডি-তে চাকুরি করেন।) ২. অসীম দেববর্মা (এগ্রিইঞ্জিনীয়ার, অবসরপ্রাপ্ত ত্রিপুরার কৃষি অধিকর্তা)। ৩. আমি নিজে। ৪. কুমার কৃষ্ণকিশোর দেববর্মা (শিক্ষক-ত্রিপুরা সরকার)। স্কুলের মন্ত্রীসভায় অসীম ছিলো প্রধানমন্ত্রী, আমার অর্থবিভাগ, বল্লভ আর কৃষ্ণকিশোর যে কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলো, আজ আর সঠিক মনে নেই। স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে প্রতি বিষয়েই খুব প্রতিযোগিতা ছিলো স্কোয়াডে স্কোয়াডে। হেডমাষ্টারমশাইয়ের ঘরের সামনে একটা স্কোর বোর্ড থাকতো, তাতে ফিতে দিয়ে বিভিন্ন স্কোয়াডের মাসিক ফল লেখা হতো। যে স্কোয়াডের ফিতে যত লম্বা, সে মাসে সে স্কোয়াড তত ভালো ফল করেছে বোঝা যেতো। মাসের শেষে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়তাম স্কোর বোর্ডের ওপর। একাডেমিতে প্রয়াত শিতিকণ্ঠবাবু এক অদ্ভুত ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। নাম ছিলো 'অনেস্টি টেস্ট'। প্রধান শিক্ষকের ঘরের লাগোয়া বারান্দার মধ্যে টেবিলে বেঞ্চের ওপর ছাত্রদের স্কুলে হঠাৎ যা যা লাগতে পারে, যেমন খাতা, কলম, কাগজ, বিস্কুট, লজেন্স, পেন্সিল, কালি এইসব সাজানো থাকতো। আর তার উপর দাম লেখা থাকতো দোকানের মতো। কিন্তু কোন দোকানদার ছিলো না। টাকা-পয়সা ফেলার জন্য মাঝখানে ফুটো করা, তালা দেয়া একটা বাক্স ছিলো। অর্থমন্ত্রী হিসেবে এর সব দায়দায়িত্ব ছিলো আমার উপর। সুপরিচিত ব্যবসায়ীর পুত্র হিসেবে বাজারের পাইকারী দোকানদারেরা বাবার পরিচিত ছিলো এবং পয়সার টান পড়লে মাঝেমধ্যে বাকিও পাওয়া যেতো। তাই আমিও অতি সহজেই বাজার থেকে বেশ কম দামে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতাম বা কিনে

আনতাম। ছাত্র এবং মাষ্টারমশাইরা স্কুলের এই দোকান থেকে প্রচুর জিনিসপত্র কিনতো। পয়সার টান পড়লে ছাত্ররা কাগজে নাম, শ্রেণী, রোল নাম্বার এবং শিক্ষকমশাইরা নাম লিখে জিনিসপত্র নিয়ে যেতেন। পরে স্লিপ নিয়ে পয়সা দিয়ে যেতেন। আমার সময় কখনো এক পয়সাও গড়বড় হয় নি। পূজনীয় শিক্ষক শ্রী নিধুরাম চক্রবর্তী এর দায়িত্বে ছিলেন। অঙ্কের শিক্ষক স্বর্গীয় কালিপদ চক্রবর্তী হিসেবপত্র দেখতেন সহকারী হিসেবে। ডিসিপ্লিনের পুরস্কারের দিকে সকলের তীক্ষ্ণ নজর ছিলো।

ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে আমরা বিদ্যালয় সংলগ্ন গাছতলায় সারিবদ্ধ হয়ে জড়ো হতাম। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। তারপর কল্যাণবাণী পাঠ । প্রতিদিন একটা কল্যাণবাণী থাকতো আর তাকে প্রার্থনা সভায় বুঝিয়ে বলার জন্য এক এক স্কোয়াডের দায়িত্ব থাকতো এক এক দিন। প্রথম দিন একজন শিক্ষকমশাই তার ব্যাখ্যা দিতেন। তারপর থেকে ছিলো ছাত্রদের পালা। চার স্কোয়াডের চার দিন। দিনের কল্যাণবাণীটি একটি বোর্ডের মধ্যে লেখা থাকতো। তার মধ্যে ভালো বলা এবং সুন্দর লেখার প্রতিযোগিতা ছিলো স্কোয়াডের মধ্যে। শিক্ষকমশাইরা কল্যাণবাণী ঠিক করে দিতেন। প্রথম কল্যাণবাণী বলেছিলেন শিতিকণ্ঠবাবু নিজে। সেটা ছিলো মানুষ হওয়ার ফরমূলা।

A = X+Y+Z এটা আইনস্টাইনের দেয়া। অর্থঃ A = সিদ্ধিলাভ, X = কম কথা বলা, Y = খেলার মতো কাজ করে যাওয়া, Z = সময় জ্ঞান। — যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটা এইরকম, একবার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ এলবার্ট আইনস্টাইনকে বৈজ্ঞানিকরা এক সভায় ধরলেন যে, আপনি এত সব ফর্মুলা তৈরি করছেন, এবার মানুষ হওয়ার ফর্মুলা বলুন না। কিছুক্ষণ ভেবে আইনস্টাইন বোর্ডে গিয়ে এই ফর্মূলাটি লিখে দিলেন। বললেন, ফুটবল নিয়ে প্লেয়ার যখন গোলের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যেভাবে একাগ্রতার সাথে এগিয়ে যায়, সেভাবে কাজ করতে পারলে, কম কথা বলা আর পাঙ্কচুয়ালিটি থাকলে জীবনে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকে নানা অমৃত তত্ত্বকথা ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন করা হতো কল্যাণবাণীতে। বার্ষিক পুরস্কারের নির্বাচন করতেন শিক্ষকদের কয়েকজন মিলে একটি গ্রুপের মাধ্যমে। প্রতিটি বিষয়ে নির্বাচন এই শিক্ষকমণ্ডলীই করতেন।

ছাত্রদের একটা 'পুয়োর ফান্ড' থাকতো অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমার হাতে। তার হিসেবের খাতা আর টাকার বাক্স থাকতো শিতিকণ্ঠস্যারের আলমারিতে। নিধুস্যার দেখতেন হিসেব। স্কুলের দরিদ্র ছেলেদের বইপত্র, স্কুল ড্রেস বা স্কুলের বেতনের অনুদান বা জরুরী প্রয়োজনে লোন হিসেবে এ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা হতো। একবার মনে আছে, আমরা তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। লেজার পিরিয়ডে হঠাৎ দুটি ছাত্র এসে আমার কাছে অর্থ সাহায্য চাইলো। প্রাচ্যভারতী স্কুল থেকে এসেছে, উমাকান্ত স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হবে। আমি ওদের চিনি না, কাজেই অস্বীকার করে বললাম যে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন লাগবে। তারা জানালো প্রধান শিক্ষকই তাদের পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে দেখি (শিতিকণ্ঠস্যারের খাস পিয়ন) গঙ্গাদাও এসে

হাজির। বললো, স্যর ডেকেছেন। পরে হেডমাষ্টার মশাইয়ের অনুমোদন নিয়ে টাকা ধার দিলাম। এই ছাত্র দু'জন জীবনে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথমজন শ্রীবাস (বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ ভট্টাচার্যের ছোট ভাই, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার কর্মরত প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার)। অপরজন রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার গোপাল দত্ত, আমার সহপাঠী।

ইংরেজীর মাষ্টারমশাই ছিলেন ক্ষিতীন মুখার্জী। পড়াবার সময় তাঁর কোন বাহ্যজ্ঞান থাকতো না, এত তন্ময় হয়ে পড়াতেন। অনেক সময় এক ঘন্টার ক্লাসে দুই ঘন্টা পার করে দিতেন, তবু তাঁর কোন খেয়াল থাকতো না। তারপর থাকতো শিতিকণ্ঠস্যারের শেষের স্পেশাল অঙ্ক ক্লাস। ডাস্টার নিয়ে তিনি কতবার যে ঘুরে যেতেন, কয়েকদিন চুপিসাড়ে ক্লাসে ঢুকে এসে ইংরেজী পড়াও শুনেছেন।

একবার ক্ষিতীনস্যার, (বর্তমানের যোগব্যায়ামবিদ) রূপেন ভৌমিককে বললেন, "তুই বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করলে আমার বাঁ হাতের তালুতে চুল উঠবে।" পরীক্ষার ফল বের হবার পর রূপেন ক্ষিতীনস্যারের হাতের তালুতে চুল উঠেছে কিনা দেখতে স্কুলে গিয়েছিলো, কেন না সে পরীক্ষায় পাশ করে গেছে। ক্ষিতীনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আরে পাগলা, ও কথা বলে জেদ না চাপিয়ে দিলে তুই তো কখনো পরীক্ষায় পাশ করতি না।"ন

আমাদের অঙ্কের মাষ্টারমশাই কালিপদ চক্রবর্তী (১৯৫৮ ইং) ছিলেন সাদাসিধা। এত সহজভাবে আমাদের অঙ্ক বোঝাতেন যে তার কোন তুলনাই হয় না। আবার সময় সময় প্রয়োজনে ভূগোল বা বিজ্ঞানের ক্লাসও নিতেন। অসাধারণ সময়জ্ঞান ছিলো তাঁর। আমাদের ছাত্রজীবনে কখনো তিনি ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলেন না। শীতের সকালে এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যের সময় তিনি ছাত্র পড়াতে বের হতেন সাইকেলে চেপে। এই দৃশ্যের জন্য তিনি শহরে সুপরিচিত ছিলেন। শ্রদ্ধা পেতেন অমায়িক ব্যবহারের জন্য। চেঁচিয়ে বা জোরে কথা কখনো বলছেন — এরকম ঘটনা আমার মনে পড়ে না।

সীতানাথ সিংহ প্রাইমারি সেকশন থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, সংস্কৃত মূল বই এবং ব্যাকরণ পড়িয়েছেন। বিশুদ্ধ নদীয়ার ভাষায় বাংলা পড়াতেন এবং বলতেন। বাংলা ভাষা যে কত মিষ্টি হতে পারে তা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতাম। তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো ১৯৬৬ সালে। রিটায়ারমেন্টের পর তিনি বাড়ি ফিরে যান নি। আগরতলার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করতেন — এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রসঙ্গ তুললেই তিনি বলতেন, "এতকাল বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে এসেছি, এখন এর সৌরভ বিতরণ করেই যাই। দেবতার কাজেই তো লাগে। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।" ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে দেখা হতেই সাইকেল থেকে নেমে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললাম, "স্যার, ভালো আছেন?" আমাদের সময় এটাই রেওয়াজ ছিলো। সে সময় তিনি চোখেও ঝাপসা দেখতে আরম্ভ করেছেন। পিতৃস্নেহে আশীর্বাদ করে মুখমণ্ডলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "তা বাছা আমার ছাত্র ছিলে তা বুঝেছি। এখন মুখে দাড়ি-গোঁফ উঠেছে, চিনবো কি করে?" আবৃত্তি করে গেলেন 'ছাত্রধারা'-র সেই বিখ্যাত ছত্রগুলি ঃ

"রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু বলে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসিমুখে "বেঁচে থাকো রও সুখে"
স্পর্শ করি কেশগুলি তার।
ভাবিতে ভাবিতে যাই কি নাম? মনে তা নাই,
ছাত্র ছিল কত দিন আগে?
স্মৃতি সূত্র ধরি টানি কৈশোরের মুখখানি
দেখি মনে জাগে কিনা জাগে।
ঘন ঘন আনাগোনা কত দিন দেখাশোনা
তবু কেন মনে নাহি থাকে?
ব্যক্তি ডুবে যায় দলে মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে?
এ জীবন ভাঙে গড়ে শ্যামল সরল করে
ছাত্রধারা বহে চলে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা
কলরব সকলি মিলায়।"

উমাকান্ত একাডেমীতে ছাত্রজীবনের কত স্মৃতি একের পর এক মনে আসছে, সহপাঠীদের কথা, ছোট ভাইদের কথা, দাদাদের কথা, শিক্ষকমশাইদের কথা।

উমাকান্ত একাডেমীর ভেতরে যেখানে সিমেন্টে আর পাথরে জমানো ভারতবর্ষ আর ত্রিপুরার মানচিত্র রয়েছে, সেখানে আমরা সকলে প্রার্থনা করতাম, বিশাল জায়গা। চারিদিকে দালান, মাঝখানটা খালি। খুব সুন্দর জায়গা। ছাত্রদেরকে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান চোখে দেখিয়ে বোঝানোর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে শিতিকণ্ঠস্যার এই মানচিত্র দুটি তৈরি করিয়ে নেন। আমাদের তৎকালীন ড্রইং টিচার ননীবাবুর তত্ত্বাবধানে এটি করা হয়েছিলো। তখন থেকে প্রার্থনা সভা গাছতলায় স্থানান্তরিত হয় স্থায়ীভাবে। একাডেমীর পুকুরপারে 'ওয়ার্ক শপ' লেখা যে ঘরটি রয়েছে, সেখানে আমাদের অর্থাৎ দশম শ্রেণী 'ক' শাখার ক্লাস হতো। এই 'ওয়ার্ক শপ' শব্দটি খোদাই করে সিমেন্টের আর পাথরের চিপ্‌সে লেখা হয়েছিলো। লিখেছিলো রণবীর (রণবীর দে, অবসরপ্রাপ্ত জেলার) আর সহকারী হিসেবে ছিলাম আমি আর কৃষ্ণকিশোর। স্কুল ছুটির পর এগুলো করা হতো। ছাত্রজীবনের একটা মজার ঘটনা এইখানে উল্লেখ না করে পারছি না। মিলু আর দুলু (প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিলন চক্রবর্তী ও তার বড় ভাই দুর্গাদাস চক্রবর্তী, পরিসংখ্যান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী) ছাত্রজীবনে ছিলো 'লেইট লতিফ'। প্রার্থনার পর ক্লাসে এসে হরিপদস্যার, শ্রী হরিপদ চৌধুরী (বাংলার শিক্ষক) রোল কল আরম্ভ করতেন। ৩২ পর্যন্ত ডেকে দুই-এক মিনিট বিশ্রাম নিতেন বা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চশমা মুছে নিতে নিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসার সুরে বলতেন, "দেখা যায়?"

ক্লাস শুদ্ধ হাসির রোল উঠতো। অধিকাংশ সময় দেখা যেতো ঠিক এই সময়েই মিলু আর দুলু ছুটতে ছুটতে ক্লাসের দিকে আসছে। ক্লাস শুদ্ধ সবাই বলতো, 'হ্যাঁ স্যার'। তখন তিনি ওদের দু'জনের রোল নাম্বার ৩৩ আর ৩৪ উপস্থিত দিয়ে দিতেন এবং রোল কল শেষ করে গম্ভীরভাবে ক্লাস আরম্ভ করতেন। তাদের যদি এসময় দেখা না যেতো, তবে তাদের বাদ দিয়েই রোল কল শেষ করা হতো। ক্লাস শেষ করে উপস্থিতি অনুযায়ী তাদের নামের পাশে চিহ্ন বসানো হতো। এ অভ্যাসটা তারা সমস্ত ছাত্রজীবনে আর পাল্টাতে পারে নি। মিলনের বাড়ি জগহরি মুড়ার নিচের দিকে সরোজ সংঘের কাছে, আর আমার বাড়ি সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশনের পাশে। স্কুল ছুটির পর আমরা একসাথে বাড়িতে ফিরতাম পায়ে হেঁটে। আমার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাশের খবর (১৯৫৮ ইং) মিলন সন্ধ্যা রাতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দৌড়োতে দৌড়োতে এনে দেয়। আমরা উমাকান্ত একাডেমীর শেষ স্কুল ফাইন্যাল ব্যাচ। আমাদের সময়ে অশোক চক্রবর্তী (ডাঃ যতীশ চক্রবর্তীর বড় মেয়ের জামাই। পরবর্তীসময়ে দিল্লীতে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের অতি উচ্চপদে চাকরি করেন), বোর্ডে পঞ্চদশতম স্থান অধিকার করে (পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ) রাজ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিলো।

আমাদের সময় একটি বেদনাময় ঘটনা হলো সহপাঠী প্রতুলের মৃত্যু। উমাকান্তের হয়ে প্রগতি স্কুলের সাথে ফুটবল ম্যাচ খেলা হচ্ছিলো উমাকান্ত মাঠে। সে ছিলো গোলকিপার। একটা বল ধরার সময় বুকে লাথি লাগে। বল ধরে সে যে পড়ে গেলো, আর উঠলো না। যমে ডাক্তারে যুদ্ধ হলো। দ্বিতীয় দিনে সে মারা গেলো। শহরের সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সারি বেঁধে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শ্মশানঘাটে গিয়েছিলো। সারা শহর ছিলো বেদনাক্লিষ্ট। তার নামে চাঁদা তুলে প্রতুল মেমোরিয়াল ফান্ড করা হয়েছিলো। প্রতুলের একটা তৈলচিত্র স্কুলে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তার চিহ্নমাত্র আজ আর আছে কিনা জানি না।

আমার ছাত্রজীবনের আরেক দুর্লভ চরিত্র আমাদের গেম টিচার লাডুদা (শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ দত্ত)। ত্রিপুরার খেলার মাঠের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। খেলার মাঠে যত গণ্ডগোল বা হৈ-চৈ হোক না কেন লাড়ুদা এলেন তো সব চুপ। তিনি রেফারী হয়ে খেলা পরিচালনা করলে তো কথাই নেই। মাঠে এক কোণে চেয়ারে বসে, বাঁশি ফুঁ দিয়ে তিনি খেলা পরিচালনা করতেন। তাঁর হাতে মার খায় নি এমন কোন ছাত্র-প্লেয়ার ত্রিপুরার মাঠে ছিলো না তখন, এমনই প্রসিদ্ধ মানুষ ছিলেন তিনি।

আজ বারবার মনে পড়ছে বিদ্যালয়ের সাথে আমাদের একাত্মতার কথা। সেখানে যে স্নেহময়ী বিদ্যা-জননীর আশীর্বাদ পেয়েছি, আজও তা আমাদের হৃদয়ে স্পন্দন জাগায়।

সীতানাথ স্যার মাঝে মাঝে গল্প বলে আমাদের নিয়ে যেতেন ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, মাষ্টারদা, নেতাজীর স্বপ্নের দেশে। কখনো কখনো উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শিহরণ জাগিয়ে দিতেন বিবেকানন্দের সেই ঐতিহাসিক আহ্বান শুনিয়ে, "... হে ভারত ভুলিও না তোমাদের মাতৃমুক্তির আদর্শ, ভুলিও না তুমি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মায়ের বলিদানে প্রদত্ত ..." ইত্যাদি।

স্কুলের এই সবকিছুর ফাঁকে ফাঁকে বাবার কাছে শুনতাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অখ্যাত সেনানী আমার জ্যেঠামশাই স্বর্গীয় বঙ্কবিহারী সাহার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা, সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাবার ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর কথা, আমাদের জন্মভূমি ইতিহাসখ্যাত নোয়াখালির দাঙ্গার কথা, মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের কথা ইত্যাদি। আমাদের আত্মীয় বাড়ি ঐতিহাসিক খিলপাড়ার দাঙ্গার কথাও বলতেন বাবা।

একটা গানের কলি বাবা প্রায়ই গুণগুণ করে গাইতেন। যতটুকু মনে পড়ছে, গানটি এইরকম ঃ

"ঝড় বাদলে নিশীথ রাতে
পাড়ি দিয়ে হবে পার—
ওগো নাবিক পথ ভুলো না,
খবরদার খবরদার।
কাণ্ডারী তো গেছে অনেক,
হতে গিয়ে সাগর পার
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছে
জীবনের অধিকার—
ঝড় বাদলে ...।"

আজ আমি শৈশব কৈশোর পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়। জীবন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ছে। বৃদ্ধ পিতাও নব্বই বছর বয়সে গত হয়েছেন ৩০/৮/৯৮ ইং তারিখে। দিন যত পার হয়, আয়ু থেকে খসে পড়ে একটি একটি করে পাতা। স্বপ্ন ক্রমশঃ যতো ধূলি-ধূসরিত হচ্ছে, বাস্তবের সাথে তার দূরত্ব বাড়ছে ততো বেশী। তবুও সে সোনালি শৈশবের দিনগুলো কি ভোলা যায়? মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো সবার বড় অপরাধ। বিশ্বাস করবো— হিংসা, দ্বেষ, ভ্রাতৃদাঙ্গায় নিপীড়িত, আত্মহননে সদাব্যস্ত, দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্রে আত্মমগ্ন ভারতভূমিতে এই সত্য নিশ্চিত প্রমাণিত হবে যে, "অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি, ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।" অধর্মের জয় খুব দ্রুতগামী দেখা যায়। কেননা, এ জয় সমূলে তার বিনাশকেই সুনিশ্চিত করে।

তারাপদ চাকমা, রামেশ্বর চাকমা, নিরঞ্জন সরকার, অসীম দেববর্মা, মোহিত দেববর্মা, কৃষ্ণকিশোর, বিরাটকিশোর, কুমার নকুল কিশোর, ধ্রুব দেববর্মা প্রমুখদের সাথে মা ত্রিপুরেশ্বরীর পায়ের রাঙা ধুলো গায়ে মেখে যে ত্রিপুরাতে হেসেখেলে বড় হয়েছি, সে ধূলিকণা হয়তো হয়েছে আজ বিষমাখা, তবুও তা কোনদিন আমাদের বুকের ছবিকে করতে পারবে না ধূলিধূসরিত অথবা কালিমালিপ্ত।

ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথ

রাজ্যের গণমানুষের চৈতন্য আজ যখন ক্রুর দানবের উদ্ধত পদাঘাত আর প্রজাপালকদের চরম ঔদাসীন্যে অবলুপ্তপ্রায়, জনগণ নিজেদের ভাগ্যকে শকুনিদের পাশার চালের উপর ছেড়ে দিয়ে এক বস্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে রজঃস্বলা অসহায় দ্রৌপদীর মতো প্রকাশ্য রাজদরবারে রাজধর্ম রক্ষার জন্য বারবার আর্তনাদ করছে আর সপারিষদ দুর্যোধনেরা উল্লাসে মত্ত হয়ে তা উপভোগ করছে, বর্তমানে এমনি এক ঘোর মসীলিপ্ত যবনিকার অন্তরালে শতবর্ষ আগে শুভ্র জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত ছিলো ১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঘী শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য তিথিটির প্রভাত কিরণ।

সাহিত্যালোকের 'ভারত ভাস্কর' 'শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়' ঠিক শতবর্ষ আগে এইদিন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে প্রথম ত্রিপুরায় পদার্পণ করেন। রাজপ্রাসাদ তখন সম্পূর্ণ নির্মিত না হওয়ায় তিনি রাজ অতিথি হিসেবে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের বাড়ি তথা বর্তমান কর্ণেল বাড়িতে অবস্থান করেন (২১/০১/১৮৯৯ ইং)।

দ্বিতীয়বার তিনি যখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে এই রাজ্যে আসেন, উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন জুরি বৈঠকখানায় বাস করেন। বর্তমান জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রায় তিনশ ফুট উত্তরে ছিলো এই জোড়া বাংলা। তৃতীয়বার কবির আগমন হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে। সতেরোই আষাঢ়, মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের উপস্থিতিতে স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীর হলে (পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত চিত্রকর ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের স্বহস্তে খোদাই করা 'উমাকান্ত একাডেমী' লেখা সহ মূল ফটক দিয়ে ঢুকে সম্মুখের প্রথম ঘরটি) 'ত্রিপুরার সাহিত্য সম্মেলনী'-র সভায় সভাপতিত্ব করেন তিনি এবং বিখ্যাত 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে গুরুদেব আরেকবার আগরতলায় পদার্পণ করেন জগদীন্দ্রনাথ প্রমুখ সহ চতুর্থবারের মতো, নবনিযুক্ত রাজমন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কর্মভার গ্রহণ উপলক্ষ্যে। এই বছরেরই চৈত্রমাসে পঞ্চমবারে কবি আসেন বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য। ষষ্ঠবারে কবির আগমন ঘটে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা দরবারের আমন্ত্রণে, কার্তিক মাসে। এবার তিনি অবস্থান করেন কুঞ্জবনের মালঞ্চবাসে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার আমন্ত্রণে

কবি সপ্তম তথা শেষবারের মতো আগরতলায় আসেন। অবস্থান করেন কুঞ্জবন প্রাসাদে। ১২ই ফাল্গুন উমাকান্ত একাডেমী হলে স্থানীয় 'কিশোর সাহিত্য সামাজ' তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

কবিগুরুর ১৩১২ বঙ্গাব্দের আঠাশে আষাঢ় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ "ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহের যে যোগ ছিলো সে যোগ আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে। বিধাতার এই অভিপ্রায় বশতঃই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।"(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, ১৮৬ পৃঃ)। এ থেকে বোঝা যায় কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সংযোগ ঘটেছিলো কবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই। এরপর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয় মহারাজ বীরচন্দ্রের শাসনকালে। কুড়ি বছরের তরুণ কবির 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থটি তখন প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। এরপরের বছর প্রধান মহিষী মহারাণী ভানুমতির প্রয়াণে মহারাজ যখন শোকাঘাতে ব্যাকুল তখনই এই কাব্যগ্রন্থটি পড়ে তাঁর একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষকে পাঠান কবির কাছে এই বলে যে, কাব্যটি পড়ে তাঁর ভালোলেগেছে এবং তিনি কবিকে সম্মানিত করতে আগ্রহী। দেশের কাছ থেকে কবির তরুণ বয়সে পাওয়া এই সম্মান তাঁর জীবনে কত অপরিসীম মূল্য বহন করেছিলো রবীন্দ্র গবেষকমাত্রেই তা জানেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও কবি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।

১৮৯২ সালে মহারাজ অমর মাণিক্যের কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে 'মুকুট' গল্পটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৮ সালে এর নাট্যরূপ দান করেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'রাজর্ষি' উপন্যাস রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন কবি যখন আগরতলায় প্রথমবারের মতো আসেন, তখন তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় কুঞ্জবনে। আদিবাসীদের টংঘরের মতো করে সম্বর্ধনা মঞ্চ তৈরী করা হয়।

মনিপুরী শিল্পীদের মধুর নৃত্যগীতে কবি বিমোহিত হন। বসন্ত উৎসবে বাসন্তী রঙের বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুরনারীরা যোগদান করেন। মহারাজ স্বয়ং মঞ্চে উপবিষ্ট হন কবির সাথে। সে এক স্মরণীয় দৃশ্য। এই বসন্ত উৎসবই পরে রাষ্ট্রীয় উৎসবে পরিগণিত হয়। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের বসন্ত উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে মহারাজা যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মূল সূত্র ছিলো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মুক্ত হৃদয়ে সবাই যেন সে আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করে। মহারাজের এই বক্তব্য থেকে প্রজাদের প্রতি তাঁর বাৎসল্য তথা উচ্চ মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়বার আগমনের সময় আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রাজধানীতে সুদক্ষ বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী নিয়োগ ও শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং মহারাজা এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার সাথে নিজের যৎসামান্য দানগ্রহণ

করাতে কবিকে অনুরোধ করলে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কবি তা গ্রহণ করেন। ত্রিপুরার সাথে শান্তিনিকেতনের আত্মার সংযোগ স্থাপনের যে সেতু তৈরি হয়, রবীন্দ্র অনুরাগী মাত্রেই তা জানেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও মহারাজের এই বদান্যতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে কেবল বারবার উল্লেখই করেন নি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার তত্ত্ব না জানা সত্ত্বেও একজন রাজপুরুষের এ সম্পর্কে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও আগ্রহ, সে কথা উপলব্ধি করে জগদীশচন্দ্র যে অতীব বিস্মিত হয়েছিলেন, এ কথা তিনি একাধিক পত্রে স্বীকার করেছেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে আষাঢ়, কার্তিক ও চৈত্র মাসে পরপর তিনবার এসে কবি ত্রিপুরার সাহিত্যসমাজের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা তিনি 'দেশীয় রাজ্য' নামক মূল্যবান প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে স্বীকার করেছেন। কবিবন্ধু মহারাজ রাধাকিশোরের অকাল প্রয়াণে (১২ই মার্চ, ১৯০৯ ইং) তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। শোকস্তব্ধ কবির সাথে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সংযোগ কিছুদিনের মতো শিথিল হয়ে পড়লেও মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরের মাধ্যমে তিনি রাজ পরিবারের সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

মহারাজ রাধাকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরের আমলে, দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরে কবি রাজ্যে পদার্পণ করলে ১০ই নভেম্বর ১৯১৯ সালে কবিকে তাঁর 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির জন্য উমাকান্ত একাডেমীতে মনোজ্ঞ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কবির অনুরোধে মহারাজা ত্রিপুরাবাসী মণিপুর রাজপরিবারের কৃতী নৃত্যশিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে নৃত্য শিক্ষকরূপে পাঠান। এরপরেই মণিপুরী নৃত্যকলা বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। এরপর নবকুমার সিংহও মণিপুরী নৃত্য শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, নটীর পূজা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে দশই ফাল্গুন (২২/০২/২৬ ইং) মহারাজা বীরবিক্রমের আমলে বর্তমান রাজভবন, তদানীন্তন কুঞ্জবন রাজপ্রাসাদে যে বার রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেন সেই বার তাঁর সাথে আসেন রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী — গানের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক মরিস, পৌত্রী নন্দিনী (পুপে)। ১৩১০ বঙ্গাব্দ থেকেই ত্রিপুরার শিক্ষার্থীরা রাজসরকারী ব্যবস্থাপনায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে শুরু করেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ কবির বিশেষ আমন্ত্রণে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং ঐ দিন আম্রকুঞ্জে এক শান্ত সমাহিত পরিবেশে আশ্রমবাসীদের পক্ষ থেকে মহারাজকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কবি মহারাজাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে ত্রিপুরার মহারাজাদের পুরুষানুক্রমিক সাংস্কৃতিক চেতনার কথা জানিয়ে যেভাবে তাঁকে নন্দিত করলেন, যে কোন রাজপুরুষের পক্ষেই তা বিরল সম্মানপ্রাপ্তি।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে কবির আশিতম বয়ঃক্রম পূর্তি উপলক্ষে পঁচিশে বৈশাখ উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ দরবার অনুষ্ঠানে মহারাজা বীরবিক্রম কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান করেন। মহারাজের বিশেষ দূত স্বর্গীয় ভূপেন চক্রবর্তী ৩০শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে মানপত্রটি প্রদান করেন। এর কিছুকাল পরেই ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

বঙ্গাব্দে বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বিশ্বকবির সাথে ত্রিপুরার সংযোগ কত নিবিড় ছিলো, রবীন্দ্র গবেষকমাত্রেই তা অকপটে স্বীকার করেন। ত্রিপুরার মহারাজারা কবিকে একাধারে বন্ধু, অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আগরতলায় বসে লেখা গানগুলির সম্ভাব্য রচনাকাল হলো ১০ই থেকে ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩২ বাং (১৯২৬ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারী) ঃ

১. দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয় আকাশে।

২. ফাগুনের নবীন আনন্দে।

৩. এসো আমার ঘরে এসো (কবিগুরুর এই গানটির রচনার স্থান আগরতলা কিনা, সে বিষয়ে কোন কোন মহলে বিতর্ক রয়েছে)।

৪. বনে যদি ফুটলো কুসুম, নেই কেন সেই পাখি,

৫. আপন হারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্ন 'কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং' (বীর্যকেই সার বলিয়া জানিবে) এই সংস্কৃত বাক্যটি কবির হৃদয়ে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে কবি 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধে বলেছেন (প্রথম প্রকাশ — বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়। ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) "এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্যই সার।"

রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার শিল্প সংস্কৃতি এবং আর্থিক উন্নয়ন সহ সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও দিক নির্দেশ করেছিলেন। এ নিয়ে কবিকেও কিছু কম মনোপীড়া সহ্য করতে হয় নি। রাজ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য। তারই শুভ্র আলোকে

অবহেলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরে অর্ধশত বছরেরও বেশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দেশভাগের পর প্রথম চার বছর অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো বিপর্যস্ত। মিশ্র অর্থনীতি সংক্রান্ত মূল প্রস্তাব তখনই গ্রহণ করা হয়েছিলো নেহেরুর ধ্যান-ধারণার মধ্যে দিয়ে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পাঁচসালা যোজনা চালু করা হলো। তারপর থেকে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে একনাগাড়ে। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কয়েকটি মৌল বিষয়ে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতা-পুর্ব ভারত আর বর্তমান ভারতের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রাকে উন্নয়নের দিশারী ধরে আমাদের যাত্রাপথ আরম্ভ হয়েছিলো, সেই অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আমরা শত যোজন দূরে সরে গেছি, তা নিজেদের ভুলের জন্যই হোক বা আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তির কূটনৈতিক চালেই হোক। অভীষ্টের সাথে অর্জনের ব্যবধান বিপুল, আর প্রতি যোজনাতেই তা বিপুলতর হচ্ছে। পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের অগ্রগতির চিত্র সুন্দরভাবে বোঝানো যায়। কিন্তু বাস্তবে ধনী হয়েছে আরও ধনী, দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর। জাতীয় আয় বেড়েছে, আমাদের সম্পদও বেড়েছে বলা হয়। আর তার সাথে দ্বিধাহীনভাবে বেড়েছে অসাম্য, দারিদ্র ও কর্মহীনতা। আঞ্চলিক ধনসম্পদকে অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ধরে তাতে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের পরিমণ্ডল গঠন করার কথা ছিলো। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে বিপরীত। ধনীর যেমন ধন বেড়েছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে আর্থিক বলশালী রাজ্যগুলি আরও বলীয়ান হয়েছে। সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে শোষণের পরিমণ্ডল গঠনের ফলে। রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুপাতে ভোটের মূল্যায়ন, তা থেকে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি এবং পরিশেষে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অধিকারের মূল্যায়নে জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো এবং রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে বেশী বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পরেই এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের কথাটা তাঁর মনে দাগ কাটে বিশেষভাবে। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে তিনি একটি কমিটিও গঠন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সচিবদেরকে নিয়ে একটি বিশেষ তদারকি কমিটিও গঠিত

হয়। ১৯৭৯ সালে আসামের ঘটনাবলীই তাকে এ সমস্ত পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দেয়। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে এসব হলো। কিন্তু বাস্তবে লাভ কিছুই হয়নি। বরঞ্চ বঞ্চনা আরও বেড়ে গেলো। ১৯৭২ সালের আগস্টমাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ গঠন করা হলো এই অঞ্চলের সাতটি রাজ্য আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং অরুণাচলকে নিয়ে। অনেকে একে এককথায় 'সাত বোনের রাজ্য' বলে থাকেন।

এই আঞ্চলিক কমিটির সাথে কেন্দ্রীয় সচিব কমিটির যোগাযোগ বড়ই ক্ষীণ হওয়াতে সে সময়কার এন. ই. সি-র চেয়ারম্যান এল. পি. সিং কয়েকটি বৈঠকেই ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন নি। বস্তুতঃ ধরা যেতে পারে জন্মলগ্নেই কেন্দ্রের সর্বনাশা অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে এই 'সাত বোন'। প্রতি বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীমণ্ডলের সদস্যবৃন্দ এ অঞ্চলের জনগণের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ আর অনুরাগের কথা বলেন যা এ অঞ্চলের মানুষের কাছে দিল্লীর মসনদের গতানুগতিক 'শুকনো আদর' বলেই মনে হয়।

এই অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ যে দারিদ্র সীমারেখার নিচে বাস করে তা সরকারের নথিতেই প্রকাশ। (২০০৩ সালে, ৭৪ শতাংশ রাজ্যের মতে/৭৬ শতাংশ কেন্দ্রের মতে)। কিছু রাস্তাঘাট করা হয়েছে সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে। উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা সেখানকার সাধারণ মানুষকে যে প্রাচুর্য এনে দিয়েছে, এ অঞ্চলের মানুষের কাছে তা দুরাশা। ওড়িশা, বিহার সহ পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যগুলি ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চল।

পরিষদের বৈঠকে মন্ত্রীরা এসে যে সমস্ত আশ্বাসের ফুলঝুরি ছুটিয়ে যান মুক্ত কণ্ঠে, তাকে যদি উন্নয়নের শর্ত ধরা হতো, তা হলে এ অঞ্চল ভারতের সবচেয়ে উন্নত বলে নিঃসন্দেহে ধরা যেতো। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মনোভাবই এই অঞ্চলের উন্নয়নের পথে বড় বাধা। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন এন. ই. সি.-র চেয়ারম্যান বি. কে. নেহেরুর অভিজ্ঞতা প্রণিধানযোগ্য। ১৯৭৩ সালে তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এক স্মারকলিপিতে অভিযোগ করে বলেছেন যে স্থানীয় কাঁচামালকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগাবার উদ্যোগ নিতে গিয়ে শিল্পসংক্রান্ত মন্ত্রক থেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়, যোগাযোগের অভাবে এখানে এধরনের কোন উদ্যোগ নেয়া যাবে না বলে। আর যোগাযোগের ব্যবস্থাপক রেলমন্ত্রকে গিয়ে তাঁকে শুনতে হয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবেই নাকি এ অঞ্চলে রেল যোগাযোগের প্রকল্পগুলি ফাইলবন্দী হয়ে আছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি আজও হয়নি। শিল্প সম্প্রসারণ তাই সুদূরপরাহত। যা চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এতে না আছে কোন গতি না কোন প্রগতি। আমরা পুঞ্জীভূত ব্যথা নিয়ে যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়েছি। শ্রী বি. কে. নেহেরু থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যপালই এই সঙ্কট মোচনের জন্য আর্তনাদ করে এসেছেন। যথারীতি তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপর সেগুলো পাঠানো হয়েছে হিমঘরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তবুও জোর গলায় চেঁচিয়ে বলেন, এ অঞ্চলের প্রতি কোনও বৈষম্য নাকি করা হচ্ছে না।

দেশভাগ থেকেই আরম্ভ করা যাক। এ. বি. আর বা আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কিছু

রেলপথ যা আসামের মূল ভূখণ্ডকে জুড়ে আছে, তাছাড়া এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প পরিমণ্ডল গঠন করার মতো যোগাযোগের কোন সুলভ সূত্র নেই। আসামের সাথে অন্য ছ'টি রাজ্যের যোগাযোগের সূত্র সড়ক পরিবহন। যদিও ত্রিপুরাতে মাত্র এগারো কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে ১৯৬৩ সাল থেকে। আর ১৯৮৬ সালের ২৬শে মার্চ বুধবার, ভারতের শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি. এ. সাংমা ধর্মনগর-পেচারথল মিটারগেজ রেলপথের টুকরো পথটুকু উদ্বোধন করেছিলেন, যদিও তা এখন প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থাতেই রয়েছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে সমস্ত কৃষি পণ্য ছিলো তা বাজারজাত হতো বর্তমান বাংলাদেশের মাধ্যমে, প্রতি রাজ্যের সাথে তখন রেল যোগাযোগের সূত্র ছিলো। দেশভাগের পর এই অঞ্চলগুলির দায়িত্ব নিয়েছে রেল মন্ত্রকের এন. এফ. রেলওয়ে। কেবলমাত্র আর্থিক লাভই কোনও অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের রাষ্ট্রীয় শর্ত হতে পারে না। সাংবিধানিক মৌলিক দায়িত্বও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই অঞ্চল থেকে সে ধরনের বড় শোরগোল না তুলতে পারায় তা দিল্লীর মসনদের বঞ্চনার শিকার হয়েছে বারবার। এই পুঞ্জীভূত বেদনাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের তরুণ মানসে উগ্রপন্থার বিষবৃক্ষ রোপন করে সুচারুভাবে। যা মহীরুহরূপে রূপান্তরিত হয়েছে এখন। উত্তরবঙ্গ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের গা ধরে বহু পুরোনো সেই ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত আসাম-বেঙ্গল রেলপথের উত্তর কাছাড় ধরে শিলচর হয়ে ত্রিপুরায় আসা। এইটুকু ছাড়া আর কোনও রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই এই সাত রাজ্য জুড়ে। বর্তমান লেখক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলো দীর্ঘকাল। সেখানে রেল মন্ত্রকের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছে নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতার সাথে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে লড়তে হয়েছে, এমনকি পাট রপ্তানির জন্যও রেল ওয়াগনের অপ্রতুলতার বিরুদ্ধেও।

যোজনার প্রায় প্রথম থেকেই লোহা, ইস্পাত, কয়লার মত শিল্প উৎপাদনকারী কাঁচামালের ভরতুকি দিয়ে কেন্দ্র গুজরাটের কান্দালা বন্দরকে গড়ে তুলতে নজর দিয়েছিলেন। কিন্তু এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা কেবলই বঞ্চনা। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঘাঁটি গৌহাটিতে বসিয়ে তাতে কিছু কোটিপতির ফেঁপে-ফুলে ওঠার সুপরিকল্পিত উপায় ছাড়া আর কিছু হয়নি। কাঁচামাল এনে কোটি কোটি টাকা সাবসিডি নিয়ে গেছে এ সমস্ত রাঘব বোয়ালরা, উচ্চ পর্যায়ে বখরা দিয়ে। সুস্পষ্ট উদাহরণ, ত্রিপুরার স্টেনলেস স্টিলের ফ্যাক্টরি, রোলিং মিল ইত্যাদি। এরকম প্রতি রাজ্যের ক্ষেত্রেই হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে তা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ আর আসাম থেকে চা পরিবহনের ক্ষেত্রে ভরতুকি দেয়া হলেও অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে সিংহভাগ জুগিয়েছে এই অঞ্চলের হৃত দরিদ্র মানুষগুলি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ হয়নি এ অঞ্চলে। অথচ সমগ্র ভারতের মোট ত্রিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জলশক্তি রয়েছে এ অঞ্চলে, অর্থাৎ এখানেও বৈষম্য। ত্রিপুরাতে বসে এই অবিচার আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তের ফলে 'গোমতী প্রজেক্ট' যে পর্বতের মূষিক প্রসব করে চলছে, আর এই শ্বেতহস্তী পালনে যে অর্থ অপচয় হচ্ছে তাতে আরও দু-

একটি নতুন প্রজেক্ট করা যেতো। অর্থাৎ যে কোনভাবেই হোক রাজ্যকে তথা এই অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যময় হওয়া সত্ত্বেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে না দেবার একটা পাকা মাথার চাল রয়েছে।

আসামকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করার উদাহরণ খনিজ তেল। ১৯৫২ সালে নাহারকাটিয়ায় তেলের সন্ধান পাওয়া গেলে তা বহু বছর, প্রায় এক দশক অব্যবহৃত থেকে যায়। সেসময় মুম্বাইয়ে মস্ত বড় দুটি আর বিশাখাপত্তনমে একটি মোট তিনটি তৈল শোধনাগার তৈরি হয় বিদেশী সহযোগিতায়। সে রাজ্য হয় বিত্তশালী আর এই অঞ্চল রয়ে যায় বঞ্চনার শিকার হয়ে।

প্রায়শই আমরা পত্র-পত্রিকাতে দেখি উত্তর-পূর্বাঞ্চল নাকি প্রাকৃতিক তেলের সাগরে ভাসছে। ডঃ ত্রিগুণা সেন ত্রিপুরা থেকে সংসদ নির্বাচিত হয়ে গিয়ে এরাজ্যে ও. এন. জি. সি-র কর্মযজ্ঞের পত্তন করেন। আশা করা গিয়েছিলো বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কেন্দ্র সেই 'তরল সোনা' উদ্ধার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। অন্তত প্রত্যন্ত এই রাজ্যকে ধুঁকে ধুঁকে চলার অর্থনৈতিক রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু সেই আশার গুড়ে বালি। পেট্রোলিয়াম শিল্পের যত সমৃদ্ধি ও সমারোহ তার সবই গুজরাট আর মহারাষ্ট্রের অঞ্চল জুড়ে। আসাম বা ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় সরকার যে আত্মহননের পদ্ধতি নিয়েছে তা আমরা নিজের চোখেই দেখলাম। বড়মুড়াতে কোটি কোটি টাকার প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে, এ রাজ্যের উন্নয়নে তা লাগানো হলো না। উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে এই বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস দিন যতো যাচ্ছে ততো বেশী দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এই বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা। হাঁড়িতে টান পড়লেই ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াটা জমে ওঠে। সেই সূত্রেই ক্রূর রাস্তা ধরে এখন উগ্রপন্থার বিষবৃক্ষটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে এই অঞ্চল জুড়ে। ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের দমন করতে ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বন্ধ করতে অনেক রক্ত ঝরছে। আসামের উলফাকে নিয়ে যা হচ্ছে বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বসবাসকারী প্রতিটি রাজ্যে মানুষের মনে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বা সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তার মূলে যে রয়েছে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক বঞ্চনার নীতি তাতে কোথাও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কেন্দ্রের বঞ্চনার এই কুৎসিত রূপ ছাড়াও আরও বঞ্চনার ইতিহাস রয়েছে রাজ্যের যোজনার অর্থ বন্টনের মধ্যে এবং অর্থ কমিশনের প্রতি রাজ্যের জন্য আর্থিক বিলি-বন্টনের সাম্প্রতিক পরিবর্তিত নীতির মধ্যে। ১৯৮৮-৮৯ সালের আর্থিক বছর পর্যন্ত এতকালের অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ্যের অর্থ বন্টনের নীতি (ফাইনডিং প্যাটার্ন অব লোন এক্সপেনডিচার ১৯৮৮-৮৯) চলে আসছিলো। অর্থাৎ রাজ্যের প্ল্যান বা নন্-প্ল্যান খাতের সমস্ত খরচই কেন্দ্র যোগাতো ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছর পর্যন্ত। এ রাজ্যের আয় বলতে বোঝায় ঃ ১. রাজ্যের রাজস্ব খাতে আয়। ২. সংবিধানের ২৭৫ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কেন্দ্রীয় অনুদান। ৩. আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাবদ কেন্দ্র থেকে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রাপ্য অংশ এবং ৪. স্বল্প সঞ্চয়ে প্রাপ্য রাজ্যের অংশ। মনে করা যাক, এইসব খাতে রাজ্যের প্রাপ্তি মোট ১০০ কোটি টাকা।

আর খরচ ১০২ কোটি টাকা। এখানে খরচ বলতে বোঝাবে সরকারের পরিচালন বাবদ খরচ এবং অনুৎপাদক খরচ যথা বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালন বাবদ রাহা খরচ। তাহলে ঘাটতি রয়ে গেলো ২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন নন্-প্ল্যান হেড-এ এই দুই কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করে দিতেন। এই মোট ১০২ কোটি টাকার শতকরা ৯০ ভাগ কেন্দ্রের অনুদান (গ্রান্ট হিসেবে) আসতো এবং দশ ভাগ আসতো ধার (লোন) হিসেবে। অর্থাৎ প্ল্যান এক্সপেনডিচার ১০০ কোটি টাকা দেয়া হতো। আর দুই কোটি টাকা নন্-প্ল্যান এক্সপেনডিচার-এর ফাঁক পূরণের জন্য দেয়া হতো। এভাবে রাজ্যের বাজেট পূর্ণ করার নীতি চলে আসছিলো।

১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছর থেকে অর্থ মন্ত্রক এবং যোজনা পর্ষদ শুধুমাত্র ঘাটতি পূরণের অংশই প্রত্যাহার করে নেয়নি, উপরন্তু ঘাটতি পূরণের জন্য রাজ্যের অর্থকোষে বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ থেকেও অংশ নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ রাজ্য এক আর্থিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। এই উদাহরণ থেকে বলা যায়, ধরা যাক, বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ ছয় কোটি টাকা ও মিসিলিনিয়াস ক্যাপিটাল রিসিপ্ট চার কোটি টাকা — এই হলো মোট দশ কোটি টাকা। তাহলে কেন্দ্রীয় সাহায্য হবে ৯০ কোটি টাকা। এই নিয়ে হলো ১০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কোনও গ্যাপ থাকতে পারবে না। কেন না ফিনান্স কমিশন পুরোপুরি ব্যালেন্স করে দিয়েছে খরচের সবটুকু। যদি নির্ধারিত খরচের বাইরে (এপ্রুভড্ সিডিউল্ড এক্সপেনডিচার সিলিং) কোনও রাজ্য খরচ করে তাহলে সে রাজ্যকে তার নিজস্ব আয়ের সূত্র থেকেই তার ঘাটতি পূরণ করতে হবে। কেন্দ্র এই অর্থের কোনও বরাদ্দ কোন অবস্থাতেই দেবে না।

এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যয় বন্টনের নীতির ফলে ত্রিপুরার রাজকোষ শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নাভিশ্বাস উঠেছে রাজ্য সরকারের। প্রায় ১১২ কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে রাজ্যের সরকারী কোষাগার থেকে কর্মচারীদের বর্ধিত হারে বেতন আর বকেয়া অর্থ নগদ দেবার ফলে। এক অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে এই রাজ্য সরকারকে।

প্রাকৃতিক গঠনের বৈচিত্র ও অবস্থানগত অসুবিধার কারণে এই অঞ্চলে সরাসরি শিল্পের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। কিন্তু প্রকৃতি অকৃপণভাবে এই অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সম্পদ ঢেলে দিয়েছে। আসামের তেল নিয়ে যাওয়া হয় বারাউনিতে যুগ যুগ ধরে। ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে দেয়া হয়, কিংবা বাতাসে মিলিয়ে দেয়া হয় রাজনৈতিক কারণে। এ রাজ্যে স্বার্থসিদ্ধির কারণে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না করে সড়ক পরিবহনকে স্থায়ীভাবে রাখা হয়। এই অঞ্চলের সম্পদ এমন পরিকল্পিতভাবে দেশের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে যা অতীতের ব্রিটিশরাজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণের ষড়যন্ত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সেখানে ছিলো ব্যক্তিগত বেনিয়াগিরি, পরে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তাতে যোগ দেয়। আর এখানে সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে নস্যাৎ করে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এক গোষ্ঠীগত অঞ্চলের প্রজন্ম। ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষকে।

অথচ রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী এমনকি রাজ্যপাল পর্যন্ত সকলেই দেশের মহান

সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে গদিতে আসীন হয়েছেন। সকল রাজ্যের প্রতি আর্থিক অবস্থার সমবন্টনের, সমান সুযোগের, সমান অধিকারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এবং অনুন্নত অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর নিয়ে, তাদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে মিলিয়ে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন তাঁরা।

এই তো সেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক মন্ত্রী মহোদয় আগরতলায় এসে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের দাম কমাবার কথা, ভোক্তাদের স্বার্থ দেখার কথা বলে গেলেন। কিন্তু সরকার যেখানে নিজে আইন ভাঙে, সেখানে তার শাস্তি কী হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয় তার কিছুই বললেন না। পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে, রেলের মাসুল বাড়িয়ে, অথবা উৎপাদনের খরচ বাড়িয়ে কিভাবে যে জিনিষপত্রের দাম কমানো যায়, সে অঙ্কের কিছুতেই মিল হলো না, গরমিলই রয়ে গেলো। প্রতিশ্রুতি আর প্রাপ্তির এই আকাশপাতাল গরমিলই হতভাগ্য, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পর্ণকুটিরের মানুষগুলিকে আরও হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের চোখের জলের হিসেব বোধ করি কেউই আর রাখে না। কোনও পরিকল্পনার বাস্তবচিত্রেও তা ধরা পড়ে না।

উগ্রপন্থা ও ত্রিপুরা— কিছু তথ্য

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য বেশ কিছু পথ পরিক্রমা সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যেই ১৫ই আগস্ট দিনটির শৌর্যবীর্য, রক্তে উথালপাথাল করা ভাব অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মনে হয় স্বাধীনতার যৌবনের উপর সায়াহ্নের ছায়া পড়েছে অনেকটা প্রলম্বিত গোধূলির ছায়ার মতো। ১৫ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস, যার আকাঙ্ক্ষায় শত শত শহীদের বুকের তাজা রক্তে এদেশের মাটি হয়েছে রাঙা, সাতচল্লিশের কিছুকাল পর্যন্ত যা ছিলো ভারতের কোটি কোটি মানুষের কাছে পরাধীনতার শিকল ভেঙে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'র দিন, এখন তা হয়েছে মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতা বা তস্য উপনেতাদের সেজেগুজে মিথ্যা ভাষণ তথা প্রতিশ্রুতি প্রদানের দিন। সরকারী আমলা-কেরাণীর গুড বুকে যাওয়ার প্রত্যাশায় জো হুজুর সেজে হাত কচলাবার দিন অথবা হুকুম তামিল করার জন্য অনেকটা নিমপাতা চিবিয়ে মিষ্টি হাসার দিন। জনতার অর্থভাণ্ডার লুটেরাদের খানাপিনার দিন এবং গান্ধী টুপি ও সদ্য পাট ভাঙা পোষাক পরে দেশসেবক সেজে সভা-সমিতিতে বিশিষ্ট আসন জুড়ে বসে থাকার দিন। আর দারিদ্র্য ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত অন্নহীন, বস্ত্রহীন, এদেশের শতকরা চল্লিশ শতাংশের হৃদয়ে তা সোনালি আশার প্রদীপ জ্বেলে আগামীদিনের নব প্রভাতের প্রতীক্ষার দিন।

১৫ই আগস্টের মধ্যরাতের রোমাঞ্চকর স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দৃশ্য এখন আমরা প্রায়ই টিভিতে দেখি। কিন্তু এ যুগের প্রজন্মের মনে তা রেখাপাত করে না। কেন না, তারা এর পিছনের ইতিহাসের সাথে, তার রক্ত লেখা অক্ষরগুলোর সাথে পরিচিত নয়। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তে জওহরলালজী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের শপথ বাক্য পাঠ করেই মধ্যরাতে জাতির উদ্দেশে ইংরেজীতে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন, "মধ্যরাতের ঘন্টা বাজার সাথে সাথে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে, ভারতবর্ষ তখন জেগে উঠেছে এক নূতন রাষ্ট্রের জন্মক্ষণ ঘোষণা করে।" ইত্যাদি। জওহরলালজীর ইংরেজীজ্ঞানের খ্যাতি বহুবিদিত। তৎকালীন জীবিত ইংরেজী সাহিত্যিকদের মধ্যেও তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রচনাকুশলী, একথা বহু ইংরেজ সমালোচকও স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর ইংরেজী জওহরলালের মতো সাহিত্যপ্রধান ও

আবেগমুখর নয়। কিন্তু তাঁর স্বচ্ছতা ও অলঙ্কারহীন মাধুর্য পবিত্র বাইবেলকে স্মরণ করিয়ে দেয় বহু ক্ষেত্রে। মিস্টার জিন্না ছিলেন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী। ইংরেজীতে সওয়ালে তার দক্ষতা অসাধারণ। এই তিন নেতাই স্বাধীনতার আন্দোলনে দীপ্তিময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

নেহেরুজীর এই ভাষণ কোন লিখিত ভাষণ ছিলো না। ছিলো তাৎক্ষণিক, প্রস্তুতিবিহীন ভাষণ। স্বাধীনতা লাভের প্রাক মুহূর্তগুলো ছিলো ঝঞ্ঝামুখর, প্রতিক্ষণেই উত্তেজনাময় পরিবর্তন। তাই তিনি সময় করে উঠতে পারেননি লিখিত ভাষণ প্রস্তুত করার জন্য। ঐতিহাসিক সেই পবিত্র ক্ষণে দেশবাসীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন, তাদের আগামীদিনের সোনালি স্বপ্ন বোনার, এক ঐতিহ্যময় শক্তিশালী ভারত গড়ার, কালক্রমে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশের প্রতিটি কালোবাজারীকে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চাবুক মারার যে শপথ সেদিন তিনি নিয়েছিলেন, অদৃষ্টের পরিহাসে সে কালোবাজারীরাই রাজনীতিবিদ আর সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় এ দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদকে সেই ল্যাম্পপোস্টেই বেঁধে রেখে দিলো। দেশ বৈদেশিক ঋণের ফাঁদে চিরকালের জন্য বাঁধা হয়ে রইলো। প্রতি দুই সেকেণ্ডে এ দেশের মাটিতে যে শিশুর জন্ম হচ্ছে, সূর্যের আলো দেখার আগেই সে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের বোঝা মাথায় বহন করেই এই সংসারে বড় হতে থাকে। এ অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি নেই, অন্তত আগামী অর্ধ শতাব্দী।

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাঁদ-এ হিন্দুদের ওয়েটেজ তো যায়ই, তারা আরও বেশী সংখ্যালঘু হয়ে যান আইনসভায়। ইংরেজদের প্রশ্রয়ে চাকরি-বাকরিতে যোগ্যতর হিন্দুদের ডিঙিয়ে কম যোগ্য মুসলমান বহাল হন, ঠিক যেমন এখন প্রশাসনে এবং শিক্ষাক্ষেত্র সহ সর্বক্ষেত্রে মেধাবী এবং যোগ্যতর প্রার্থী বঞ্চিত হচ্ছে। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনে প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলে মুসলমানই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংখ্যাগুরু। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরেও কংগ্রেস বাংলার প্রধানমন্ত্রী হতে পারলো না। আরও একবার আইন অমান্য করলেও বাংলাদেশের আইনসভায় বা সরকারে গরিষ্ঠতা পেতো না। বাংলার হিন্দুরা স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে এত রক্ত দিয়েছেন যে, শুধু বাংলার মুসলমান কেন, পাঞ্জাবকে বাদ দিলে, সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশও এর সাথে যোগ দিলেও তার কাছে ধারে যেতে পারবে না। তাই বাংলার হিন্দুরা রাজক্ষমতার সবটা না হোক খানিকটা পাবার জন্যই বাংলা ভাগে উদ্যোগী হন। মাউন্টব্যাটেন তাদের ইচ্ছা পূরণ করেন এইভাবে বঙ্গভঙ্গের কূটকৌশল প্রয়োগ করে। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ফেডারেশন নিয়ে ভাবনা চিন্তা এক নতুন মোড় নিয়েছিলো। এতদিন যারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতেন, প্রস্তাবিত ফেডারেশন গঠনে হিন্দু প্রাধান্য পাওয়ার আশঙ্কায় তারা নিজেদের ভারতীয় বলে আর স্বীকার করতেই চাইলেন না। ঠিক এখন যেমন এ রাজ্যের আবহাওয়ায় কিছু অংশের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমরা ভারতীয় নই। এক উল্টো বাতাসের তীব্র ঝাপটা আমাদের চোখ করে দিচ্ছে অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দেহ করে দিচ্ছে ধূলি ধূসরিত। লর্ড প্যাথিক লরেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, "Mr Jinnah, are you not an Indian?" জিন্না সাহেব উত্তর দেন, "No, I am not an Indian."

তার সাথে এক মত হন অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান। [Freedom at Midnight. By Larry Collings and D. Lapierre] হায়! অদৃষ্টের কি পরিহাস, এখন সুন্দরী জম্পুই বা তার আশপাশের অঞ্চলে রাজ্যের প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে বেরিয়ে আসা এক শ্রেণীর যুবকদের ভাবনা-চিন্তার সাথে এই মতামতগুলের কত মিল! সেখানে ইংরেজ শাসক লরেন্স আর এখানে নায়ক ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব মিঃ পদ্মনাভাইয়া। এই তথাকথিত শিক্ষিত যুবক যুবতীরা নিজেদের ভারতীয় বলতেই চান না, অতি কষ্টে স্বীকার করেন। এ সমস্ত তথ্যের মূল দলিল সম্ভবত রয়েছে ত্রিপুরার মুখ্য সচিবেরই কাছে। যার অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন আগে লৌহকপাট ভেদ করে রাজ্যের সংবাদপত্রে। সংবাদে প্রকাশ যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বৈরী সহযোগীরা রয়েছে। প্রশাসনের গোপন খবর কি করে প্রকাশ হলো, এ নিয়ে তখন প্রশাসনিক ভূমিকম্পন শুরু হয়েছে।

মিঃ জিন্না চাইলেন হিন্দুস্তানের পাল্টা পাকিস্তান, পেলেন ইণ্ডিয়ার বাইরে পাকিস্তান। সেটাই নাকি তাদের হোমল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়া নয়। বিভিন্ন আলোচনা সভায় রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকারও প্রায়ই অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে স্বীকার করেন যে কিছু বিভেদকামী উগ্রপন্থী সংগঠন বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে এ রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাজ্যের অংশ সংযুক্ত করে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে, ইতিহাসের রথচক্র একেই বলে। আশির জুনের দাঙ্গা ছিলো তার উদ্বোধন, এখন তা শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিশাল বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ষীয়ান কিছু রাজনীতিবিদের দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে বপন করা কাল-বীজ থেকে। দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও এঁদের বিষাক্ত বীজের অঙ্কুর আজ রাজ্যের প্রজন্মের এক শ্রেণীর বুকের ভেতর যে ভেদবুদ্ধির উদ্গম করেছে, তা থেকে দেহের শুদ্ধকরণ যে সহসা সম্ভব হবে, এ বিশ্বাস থেকে বর্তমান পরিস্থিতি শত যোজন দূরে।

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন? তাহলে এর উত্তরটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আরো অতীত পটভূমি থেকে। এতে কিছু কটু কথা বেরিয়ে আসবে সন্দেহ নেই। লেনিন বলেছিলেন, "যা অভ্রান্ত বলে মনে হবে আঘাত উপেক্ষা করে তা প্রকাশ করবে। একে গ্রহণ করতে বর্তমান প্রজন্মের কষ্ট হোক ক্ষতি নেই, আগামী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে রক্ষা পাবে, রাষ্ট্রের আগামী দিন সুরক্ষিত হবে।" অতএব কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা দরকার।

ক) ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভার পর শাসক শক্তি বাঙালি এবং উপজাতি (প্রতিবাদ সহ এই শব্দ ব্যবহার করা হলো, সহজে বোঝার জন্য।) মধ্যে ভেদরেখা টেনে দিয়েছেন। সহজভাবে একেবারে ভার্টিক্যালি স্প্লিট করে দিয়েছেন তথাকথিত উগ্র এবং মাত্রাতিরিক্ত উপজাতি সংরক্ষণের নামে। সর্বত্রই তো বিভেদ নীতি প্রকট।

খ) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু বাঙালিদের মধ্যে সরকারি খাসের জমি বন্টন করে দিয়েছিলেন ত্রিপুরার পাহাড় জঙ্গলে। সরকারি রেকর্ডেই রয়েছে কতজনকে কোথায় এই জায়গা বিলি বন্টন করা হয়েছিলো। এর আর্থিক সাহায্যও দিয়েছিলেন

কেন্দ্রীয় সরকার। এখন বাঙালিদের সে জমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারে বা মানবাধিকারে, না কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ দুষ্ট হয়ে?

গ) ভারত সরকারের কোনও সেন্সাসে এমন তথ্যের উল্লেখ নেই যে, ত্রিপুরাতে উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। অথচ, এই অসত্য তথ্য বারবার মুখ্যমন্ত্রী সহ সবাই কেবল বলছেন তা নয়, সম্প্রতি পার্লামেন্টেও সাংসদ শ্রী সমর চৌধুরী এই কল্পিত তথ্য পেশ করেছেন যে, ত্রিপুরাতে উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন একদা, এখন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। অথচ এরা সকলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি অধিবাসী, যাদের তারা দুয়োরানীর মতো দেখছেন, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, এরা তাদের দ্বারা নির্বাচিত তাদেরই জনপ্রতিনিধি। ইতিহাস গণতন্ত্রের আড়ালে এই আত্মহনন নীতি ক্ষমা করবে কিনা আমাদের জানা নেই। করলেও তা আমরা দেখে যেতে পারবো কিনা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

ঘ) স্বাধীনতার পূর্বে ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমারেখা বর্তমান সীমারেখা নয়। এ অঞ্চল 'পার্বত্য ত্রিপুরা' নামেই পরিচিত ছিলো। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, নোয়াখালি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অংশ নিয়ে যে অঞ্চল ত্রিপুরার মহারাজার জমিদারীতে ছিলো, তার নাম ছিলো চাকলা রোশনাবাদ। এই অঞ্চল ছিলো শস্য শ্যামলা উর্বর ভূমি। তা থেকে সংগৃহীত রাজস্বই ছিলো ত্রিপুরার মহারাজার রাজ্যে প্রায় একমাত্র আয়ের উৎস। ঘাটতি অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চলের নিম্নভূমি সহ সম্ভাব্য সমস্ত অঞ্চলে রাঢ় ভূমির মতো ফসল যাতে আবাদ করা সম্ভব হয় এবং পার্বত্য ত্রিপুরার আদিবাসীরা যাতে কেবলমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল না থেকে এই অঞ্চলে সমতল ভূমিতে বহুমুখী ফসল আবাদ করতে সক্ষম হয়, তার জন্য ত্রিপুরার মহারাজ ঐ রাঢ় ভূমি থেকে বাঙালি চাষীদের এনে সেভাবে ফসল বপন করা বাধ্যতামূলক স্থির করে আইন প্রণয়ন করে পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত তথ্য সরকারি নথিতেই রয়েছে। (অনুসন্ধান ঃ রাজগী ত্রিপুরা, ত্রিপুরা সরকার।)

ত্রিপুরার লোকসংখ্যা গণনায় এ অঞ্চলের লোকসংখ্যাকে অবহেলা করলে বা বাদ দিলে তা গ্রাহ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে রাজগী ত্রিপুরার ভারতভুক্তির অংশটুকু পাঠকবর্গের জানা একান্ত প্রয়োজন।

মহারাজা বীরবিক্রমের ইচ্ছায় এবং উদ্যোগেই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উদ্যোগ পর্বের সমাপ্তি ঘটে ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯ইং তারিখে। এ নিয়ে নানা বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। নানা রচনার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কলঙ্ক লিপ্ত করার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু যা সত্য, যা চিরন্তন সে শুভ্রতার আলোকে মিথ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়, মহাকালের নিয়মই তাই। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা কেজো লোক। সব সময়ই কোন না কোন কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে ভালোবাসেন। এ কাজ যে সবসময় স্বদেশবাসীর উপকারে আসবে তার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তাই এদের এই কর্মফল আমাদের মাতৃভূমিকে বহুবার বহুভাবে বিপর্যস্ত করেছে এবং এখনও যে এই প্রক্রিয়া বিরামহীনভাবে চলছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ক্ষুদ্র এ রাজ্য ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এদের এই বিভেদমূলক

কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটেছে এবং জনমানসে তার ক্রিয়া গভীরভাবে দাগ কেটেছে। তবে জনমানসে সে ভুল ধরা পড়তেও বেশী দেরি হয়নি।

প্রায় বত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত আনুমানিক ১০, ৪৯১.৬৯ বর্গ কিমি. ভূমি জুড়ে আজকের ত্রিপুরার সাথে মহারাজা বীরবিক্রম শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মিল নেই। সেই সময় ত্রিপুরার ভূমি সীমানা ছিলো বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য এবং চাকলা-রোশনাবাদের ৫৫৩.৭৭ বর্গমাইল (১, ৪০৮ বর্গ কিমি.) সহ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। চাকলা-রোশনাবাদের সীমানা ছিলো তিপেরা জেলার কসবা কোতোয়ালী এবং চৌদ্দগ্রাম থানা, নোয়াখালি জেলার ছাগলনাইয়া এবং শ্রীহট্টের শ্রীমঙ্গল সহ সমগ্র অঞ্চল নিয়ে। ভারত সরকারের ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪১ সালে বর্তমান ভারতভুক্ত এই ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যার হিসেব যথাক্রমে, আদিবাসী ২, ৫৬, ৯৯১ জন, অন্যান্য ২, ৫৬, ০১৯ জন। মোট ৫, ১৩, ০১০ জন এবং এর সাথে যুক্ত হবে ঐ সময়কার চাকলা-রোশনাবাদের জনসংখ্যা (ঐ অঞ্চল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়ে যায়)। তাহলেই মহারাজা বীরবিক্রম শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রকৃত হিসেব পাওয়া যাবে। ইংরেজ সরকারের ১৮৯১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী চাকলা-রোশনাবাদের লোকসংখ্যা ৪,৬৭,২৫৫ জন। এই সরকারী তথ্য অনুযায়ী বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৮৯১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল) জনসংখ্যা প্রতি দশ বছরে মোটামুটি ৩২ শতাংশ হারে বেড়েছে। এই হিসেব ১৯৪১ সালে চাকলা-রোশনাবাদের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১২,১৪,৮৬৩ জন। তাহলে সামগ্রিক রাজগী ত্রিপুরার লোকসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় (পার্বত্য ত্রিপুরা — ৫,১৩,০১০ জন + চাকলা রোশনাবাদ ১২, ১৪,৮৬৩ জন) = ১৭,২৭,৮৭৩ জন। এর মধ্যে আদিবাসীর লোকসংখ্যা মাত্র ৬,৬৫,৬৪৯ জন। [Ref. i) Survey and Settlement of the CHAKLA ROSHNABAD ESTATE in the District Tippera and Noakhali 1892-99. By J.G. CUMMINGS. Page-25. ii) Some Basic Statistics of Tripura : By Govt. of Tripura. Page-1.]

ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরা মহারাজের চাকলা-রোশনাবাদ পরিচালিত হতো মহারাজারই আদেশ বলে। আইন-শৃঙ্খলার দায় দায়িত্ব ছিলো ব্রিটিশ সরকারের উপর। মহারাজের আদেশ কার্যকর করার জন্য একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অধীনে একটি প্রশাসনিক শাখা কুমিল্লার দিঘির পারে রাজপ্রাসাদে স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়। একজন দেওয়ান রাজকীয় মর্যাদায় ত্রিপুরার মহারাজের প্রতিভূ হিসেবে এই রাজপ্রাসাদে বাস করতেন। এই চাকলা-রোশনাবাদের বাৎসরিক আয় তখনকার সময়েই ছিলো চল্লিশ লক্ষ টাকা। এই দিয়েই আগরতলায় অবস্থিত রাজধানীর এবং মহারাজের রাজ্যের সামগ্রিক খরচ মেটানো হতো। ব্রিটিশ ভারতের ইংরেজ সরকার দেশীয় ত্রিপুরা রাজ্য এবং চাকলা-রোশনাবাদের জমিদারিকে 'অবিচ্ছেদ্য রাজ' বলে অভিহিত করতেন 'Impartible Raj' হিসেবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে ব্রিটিশ ভারতের সরকার যে নীতিতে বিবাদের নিষ্পত্তি করতেন সেই নীতিটি হলো ঃ যিনি তাদের দেশীয় 'কাছে' আইনের বিচারে চাকলা-রোশনাবাদের জমিদার

বলে গৃহীত হবেন, তিনিই সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা হিসেবে গণ্য হবেন। ১৮৭০ সালের বিলাতের 'প্রিভি কাউন্সিল'-এর বিচার অনুযায়ী তা ঠিক করা হয়।

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকের কথা। তখন মহারাজা বীরবিক্রমের শাসন কাল। অত্যন্ত দূরদর্শী মহারাজা রাজধানী আগরতলাকে ইতালীয় শৈলীতে রূপরেখা দিয়ে নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। পাহাড়-সঙ্কুল অনগ্রসর ত্রিপুরাতে একটি বহুমুখী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার স্বপ্নে ২৫৪ বর্গ একর জমি প্রদান করে 'বিদ্যাপত্তনের' নামে দলিল করে দেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকাঠামোতে জ্ঞানমুখী বিদ্যার সাথে বিত্তমুখী বিদ্যালয় স্থাপনেরও পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিহাসের করাল ছায়ায় সেই 'বিদ্যাপত্তন' তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আজ কেবলমাত্র মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। 'বিদ্যাপত্তনের' নামে দলিলের হিসেব অনুযায়ী ২৫৪ বর্গ একর ভূখণ্ডের মধ্যে বেদখলদারদের দাপটে কেবলমাত্র ৫৪ বর্গ একর ভূমিও এখন বেঁচে রয়েছে কিনা সন্দেহ। এই হস্তান্তরিত জমির মালিকদের মধ্যে এম. বি. বি. কলেজের অনেক স্মরণীয় অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণীর কর্মচারী এবং সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণও রয়েছে। এখন আবার এদের বেদখলকৃত কলেজের ভূখণ্ড নতুন করে বিক্রি আরম্ভ করেছে রাজনৈতিক ফড়িয়ারা। নানা আইনের আবর্তে আজ এই বিদ্যাপত্তনের নিজস্ব ভূমি ইতিহাসের নিদর্শন হয়ে রয়েছে এবং দিনের পর দিন প্রশাসনের অবহেলার শিকার হয়ে তার জমির পরিধি সঙ্কুচিত হচ্ছে। এ ধরণের নানা রাজন্যযুগের কীর্তি আজ ইতিহাসের ভগ্নদশায় পরিণত হয়ে বারবার আজকের গণতন্ত্রকে উপহাস করছে। ভ্রুকুটি করছে এযুগের প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের।

মহারাজা বীরবিক্রম দূরদৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছেন যে খুব শীঘ্র ভারত স্বাধীন হবে এবং তা অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে খণ্ডিত ভারতবর্ষ হবে। এরই মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী তীব্রভাবে দানা বেঁধে উঠেছে এবং ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ মদতে তা বিষবৃক্ষ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার বাতাবরণ গড়ে উঠছে সারা অবিভক্ত বাংলা জুড়ে। মহারাজা অনুভব করলেন ত্রিপুরা হিন্দুগরিষ্ঠ রাজ্য এবং অপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল চট্টগ্রামও বৌদ্ধ-হিন্দু গরিষ্ঠ অঞ্চল। এই দুই অঞ্চল একসাথে ভারতভুক্ত হলে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মানসিক অবস্থার কোন আঘাত পড়বে না এবং প্রজাস্বার্থও সুরক্ষিত থাকবে।

এর মধ্যে বর্তমান উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের মহারাজের নেতৃত্বে একদল দেশীয় রাজ্য একটি ভাবপ্রবণ এবং অবাস্তব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার পরও তারা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে থেকে যাবে। মহারাজা বীরবিক্রম তা শোনামাত্র নাকচ করে দেন। একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মহারাজা বীরবিক্রম এই সময় গ্রহণ করেছিলেন, যার কথা কোন ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেন নি। সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে সীমানা চিহ্নিত কাজে নিয়োজিত ছিলেন, যাকে ভিত্তি করে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য সড়ক বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিন্ন এক স্থলবন্দী রাজ্যে পরিণত

হতে পারে— যেমনটা আজ হয়েছে। প্রসঙ্গত, তখন আসাম-আগরতলা সড়কের কোন অস্তিত্বই ছিলো না এবং সিঙ্গার বিলেও বিমান চলাচল করতো না। যোগাযোগের উৎস হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রস্তুত এই জরুরী বিমানবন্দরও তখন পরিত্যক্ত। পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে চিরাচরিত সড়ক যোগাযোগ বজায় রাখতে মহারাজা একটি যোগসূত্র প্রস্তুত করার জন্য তৎকালীন আসামের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলৈয়ের কাছে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন যাতে হিন্দু সংখ্যাধিক্যের সিলেট জেলার ভারতে অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত হয় এবং সাথে রাজকোষ থেকে তখনকার সময়ে তিনলক্ষ টাকাও প্রদান করেন। কিন্তু গোপীনাথবাবুর চিন্তা তখন বইছিলো অন্যখাতে। সিলেট সহ ত্রিপুরা যদি আসাম ভুক্ত হয়, তাহলে বাঙালিদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুবাদে সমগ্র রাজ্যে আসামীদের পরিবর্তে বাঙালিরাই প্রাধান্য পাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে। বাঙালিরা যত বেশী কোনঠাসা হবে অসমীয়াদের তত বেশী লাভ। কাজেই ত্রিপুরার মহারাজার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো তখন ইতিহাসের এক জটিল সন্ধিক্ষণে। এর মধ্যে মহারাজা বীরবিক্রম ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণকে দিল্লী পাঠান জওহরলাল নেহেরু এবং বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে আলোচনা করতে। সাথে গেলেন কুমার পূর্ণেন্দু কিশোর দেববর্মণ। কিন্তু কোলকাতা পৌঁছে প্রতিনিধি দল মহারাজের গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ নলিনীরঞ্জন সরকার এবং দু'জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স সহ বিশেষ বিমানে আগরতলা ফিরে আসেন। কিন্তু এরই মধ্যে মহারাজা বীরবিক্রম প্রয়াত হন (১৭ই মে, ১৯৪৭ ইং, ২রা জৈষ্ঠ্য ১৩৫৭ ত্রিং। উৎস ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, ত্রিপুরা সরকার, ৩১৩ পৃঃ)। তখন মহারাজের বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর।

রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নাবালক মহারাজকুমার কিরীট বিক্রমকিশোর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবীকে রাজকীয় অভিভাবকত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর মধ্যে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে দ্রুত লয়ে। ভারত বিভাজন ছাড়া অন্য কোন উপায় খোলা রইলো না। হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। স্বর্গীয় মহারাজের অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর, ভ্রাতা রমেন্দ্র কিশোর (ননী কর্তা), এবং পুত্র পূর্ণেন্দু কিশোর (ক্ষীর গোপাল কর্তা) এবং কিছু রাজ কর্মচারী সহ দিল্লীতে গেলেন বিষয়টি আলোচনা করতে। দিল্লীতে তারা মহাত্মা গান্ধীর সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তখন হরিজন কলোনিতে বসবাস করছেন। ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে গান্ধীজীর সাথে তাঁরা দেখা করলেন। মহাত্মাজী তাদের সাদরে গ্রহণ করে জানালেন, "আমি দুঃখিত মহারাজজী, আমি আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না কারণ, আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছি। আপনারা বরং প্যাটেল এবং নেহেরুর সঙ্গে কথা বলুন। তারাই আপনাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানাবে।" আশাহত হয়ে একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে তাঁরা হোটেলে ফিরে এলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কেন্দ্রভূমি তখন দিল্লী। নেহেরু বা প্যাটেল

কেউই সে সময় সহজলভ্য ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসের অন্য এক ভূমিকা তাঁদের জন্য তখন অপেক্ষা করছে। হোটেলে ফিরে এসেই ত্রিপুরার প্রতিনিধি দল জানতে পারলেন, গৃহমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ অফিসাররা তাঁদের খোঁজ করছেন এবং বলে গেছেন পরদিন ভোর পাঁচটায় সর্দার প্যাটেলের সাথে তাঁদের সাক্ষাতকারের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তখন ত্রিপুরা সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের তেমন বেশি জ্ঞান ছিলো না। প্রতিনিধি মণ্ডলী উপমহাদেশের মানচিত্র খুলে কথা বলতেই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে প্যাটেল জানালেন, ত্রিপুরা রাজ্য চিরকালই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ছিলো, তাই যে সমস্ত রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিলো, কেবল তাদের সাথেই ভারতভুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রয়াত মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী ভারতভুক্তিতে ত্রিপুরা আগ্রহী জেনে তিনি খুশি হয়ে জওহরলালজী এবং তদানীন্তন সংবিধান প্রধান রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাথেও তাদের দেখা করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী ব্রজেন্দ্র কিশোরকে তাঁরা ভারত অন্তর্ভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর এই দলিলে স্বাক্ষর করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে প্রস্তাব দেন যে, এই ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে রাজ্যের প্রধান মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবীর স্বাক্ষর যুক্ত হয়েই কার্য সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ভারতভুক্তি চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালে ত্রিপুরার প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটি রিজেন্ট পরিষদ গঠন করা হোক। এই প্রস্তাবে প্যাটেল রাজি হলেন এবং মহারানী কাঞ্চনপ্রভা রিজেন্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন।

কথা ছিলো চাকলা-রোশনাবাদের জমিদারি সহ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যই ভারত অন্তর্ভুক্ত হবে, এটাই প্রয়াত মহারাজ বীরবিক্রমের অন্তিম ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু পথে তখন অনেক কাঁটা বিছানো ছিলো। মুসলিম নেতা এবং অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হাসান শহীদ সোরাবর্দী গোপনে ত্রিপুরায় এসে স্থানীয় কিছু মুসলিম লীগের নেতার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বোঝালেন যে ত্রিপুরা পাকিস্তানে যোগ দিলে কারও ভিটে-মাটি ছাড়তে হবে না। নিরাপদে আগের মতোই থাকবে। নানা সুবিধার প্রলোভনও দেখালেন। রাজ্যের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে পূর্ণেন্দু কিশোর দেববর্মার উদ্যোগে এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীর মাঠে নাগরিকদের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় মহারাজের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতভুক্তির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ বিস্তারিত ভাবে প্রজাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। দ্বিধাহীনভাবে একবাক্যে প্রজারা এই গৃহীত পদক্ষেপ সমর্থন করে এবং ভারতভুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। এরপরই ভারত সরকারের প্রতিনিধি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যুবরাজের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লীতে কাঞ্চনপ্রভাদেবী রিজেন্ট হিসেবে ও তাঁর নাবালক পুত্র কিরীটবিক্রম দেববর্মনের পক্ষে ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৫/১০/৪৯ইং তারিখে এই অন্তর্ভুক্তি ভারত সরকারের দলিলপত্রে ঘোষণা করা হলো এবং ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে ত্রিপুরা চিফ কমিশনার শাসিত 'গ' শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। প্রথম চিফ কমিশনার নিযুক্ত হলেন আর. কে. রায়।

১৯৫১ইং নভেম্বরে আগরতলা পুরসভার প্রথম নির্বাচনে ষোল জন কমিশনার নির্বাচিত হলেন। প্রয়াত সুখময় সেনগুপ্ত নির্বাচিত হলেন প্রথম পুরপিতা। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরেল কলেজ নির্বাচিত হলেন একজন রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য। ১৯৫৩ সালে চিফ কমিশনারকে সহায়তা ও উপদেশ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি শচীন্দ্রলাল সিংহ, জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মা ও সুখময় সেনগুপ্তকে নিয়ে তিন জনের একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করেন। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে গণ্য হয়। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী। রাজন্যপর্বের সমাপ্তির অধ্যায় থেকে পূর্ণরাজ্যে উত্তরণের এই প্রক্রিয়া ত্রিপুরার ইতিহাসে তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির চুক্তি পত্রের অনুলিপি দেয়া হলো ঃ

APPENDEX NO. E
Tripura Merger Agreement

AGREEMENT made this the nineth day of September, 1949 between the Governor-General of India and His Highness the Maharaja of Tripura.

WHEREAS in the best interests of the State of Tripura as well as of the Dominion of India it is desirable to provide for the administration of the said state by or under the authority of the Dominion Government :

IT os hereby agreed as follows :

Article-I

The Maharaja of Tripura hereby cedes to the Dominion Government full and exclusive authority, jurisdiction and powers for and in relation to the governmence of the State and agrees to transfer the administration of the State to the Dominion Government on the fifteenth day of October, 1949 (hereafter referred to as 'the said day').

As from the said day the Dominion Government will be competent to exercise the said powers, authority and jurisdiction in such manner and through such agency as it may think fit.

Article-II

The Maharaja shall with effect from the said day be entitled to receive from the revenues of the State annually for his privy purse the sum of Rupees Three lakhs and Thirty Thousand only free of taxes. This amount is intended to

of India, and no proceedings shall lie in any Court of Tripura, against His Highness the Maharaja or Her Highness the Regent whether in a personal capacity or otherwise, in respect of anything done or committed to be done by them under their authority during the period of the Regency administration of the State.

Article-VIII

1) The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of the permanent members of the Public Services of Tripura on conditions which will be no less advantageous than those on which they were serving before the date on which the administration of Tripura is made over to the Government of India or the payment of reasonable compensation.

2) The Government of India further guarantees the continuance of pensions and leave salaries sanctioned by the Government of His Highness the Maharaja to members of the Public Services of the State who have retired or proceeded on leave preparatory to retirement, before the date on which the administration of Tripura is made over to the Government of India.

Article-IX

Except with the previous sanction of the Government of India, no proceedings, civil or criminal, shall be instituted against any person in respect of any act done or purporting to be done in the execution of his duties as a Servant of the State before the day on which the administration is made over to the Government of India.

In confirmation where of Mr. Vapal Pangunni Menon, Adviser to the Government of India in the Ministry of States, appends his signature on behalf and with the authority of the Governor General of India and Her Highness Maharani Kanchan Prava Debi, Maharani Regent of Tripura, has appended her signature on behalf of His Highness Maharaja Manikya Kirit Bikram Kishore Dev Barman Bahadur, the minor Ruler of Tripura, his heirs and successors.

KANCHANPRABHA DEVI
Maharani Regent Tripura State,
V.P. MENON,
Adviser to the Government of India,

The Dated, 9th September 1949,
New Delhi
Ministry of States.

Ref : Government of India, Ministry of States. White Paper on Indian States (Delhi-1950. Appendix-XXXI. pp 229-31)

cover all the expenses on account of his personal staff, maintenance of his residence, marriages and other ceremonies, etc. and will neither be increased nor reduced for any reason whatsoever.

The said sum may be drawn by the Maharaja in four equal instalments in advance at the beginning of each quarter from the State Treasury or at such other treasury as may be specified by the Government of India.

Article-III

The Maharaja shall be entitled to the full ownership, use and enjoyment of all private properties (as distinct from State properties) belonging to him on the date of the agreement.

The Maharaja will furnish to the Dominion Government before the 10th October, 1949, an inventory of all the immovable property, securities and cash balances held by him as such private property.

If any dispute arises as to whether any item of property is the private property of the Maharaja or State property it shall be reffered to a judical officer qualified to that appointment as High Court Judge, and the decision of that officer shall be final and binding on both parties.

Article-IV

The Maharaja shall be entitled to all the personal rights, privileges, immunities and dignities enjoyed by him as the Ruler of Tripura, whether within or without the State, immediately before the 15th August, 1947.

Article-V

All the members of the Maharaja's family including Her Highnes the Rajmata shall be entitled to all the personal privileges dignities and titles enjoyed by them, whether within or outside the territories of the State, immediately before the 15th day of August, 1947.

Article-VI

The Dominion Government Guarantees the succession according to law and custom, to the gaddi of the State and to the Maharaja's personal rights, privileges, dignities and titles.

Article-VII

No enquiry shall be made by or under the authority of the Government

ত্রিপুরা ভারতের অংশে যোগদানের পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারবার অনুরোধ করেছিলেন যাতে চাকলা-রোশনাবাদকে ভারত ভুক্তিতে সম্মতি প্রদান করা হয় কেননা ঐ অঞ্চল ত্রিপুরার মহারাজারই রাজ্যের অংশ এবং সেখানে ত্রিপুরার মহারাজার আইনের শাসনই বলবৎ রয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার তৎকালীন রিজেন্ট মাতা মহারানী কাঞ্চনপ্রভার দূরদৃষ্টির অভাবে, সর্দার প্যাটেলের রাজন্য ভাতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ সেই চাকলা-রোশনাবাদ যদি ত্রিপুরার সাথে থাকতো, তাহলে ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেহারা থাকতো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আখাউড়ার মধ্য দিয়ে ভারত ভূমির মধ্য দিয়েই ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যুক্ত থাকতো। ইতিহাস লেখা হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সামান্য দূরদর্শিতার অভাব একটি জাতির জীবনে কি অভিশাপ বহন করে আনতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তির এই অধ্যায়, যার জন্য কেবলমাত্র কেন্দ্র সরকার এবং আমরা এ যুগে নয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের আগামী প্রজন্মও তার মাসুল দিয়ে যাবে।

অপর একটি ঐতিহাসিক 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' করেছেন জওহরলালজী নিজে লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের প্ররোচনায় কাশ্মীর যুদ্ধে ভারতের অধিকৃত অঞ্চল পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দিয়ে এবং এ যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। এর বিষ যন্ত্রণায় আমাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অথচ তা থেকে এখন পরিত্রাণ পাওয়ার আপাততঃ কোন রাস্তা আর খোলা নেই।

ঙ) অনেকের বিশ্বাস এই বৃহৎ বিভাজনের পাশাপাশি এখানে চলেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর খেলা। তাদের আড়ালে প্যানক্রিস্টিয়াই নেশার পালা। সন্ত্রাসবাদীদের এক অংশ কাজ করছে আন্তর্জাতিক নার্কোটিক্স ব্যবসায়ীদের হয়ে। এদের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এই শহরের কিছু প্রথিতযশা ব্যবসায়ী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা, আর তার সূত্র ধরে কিছু বহিরাগত ব্যবসায়ী। এদেরও এক অংশ যুক্ত অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সাথে। আবার কেউ কেউ পেশাদারী খুনের ব্যবসায়ও যুক্ত। পার্শ্ববর্তী বহিঃরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে সে দেশের প্রশাসনের অনেক উঁচু সিঁড়ি পর্যন্ত এদের সাথে যুক্ত। একদিন বেশী রাতে দীর্ঘ আলাপচারিতায় প্রয়াত বন্ধুবর ভূপেন দত্তরায় উত্তেজিত কণ্ঠে প্রামান্য দলিল সহ একথা আমায় বলেছিলো। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ যতই বন্ধুত্বের কথা বলুক, মুক্তি যুদ্ধের আবেগের কথা বলুক— এই আন্তরাষ্ট্র ষড়যন্ত্রের কথা তারা মুখে স্বীকার না করলেও সাংবাদিকদের চোখে ধুলো ছুঁড়ে নিষ্পাপ সফেদ কাপড়ে থাকতে পারবে না।

চ) সত্তর দশকের পূর্ব পর্যন্ত এ রাজ্যে 'উপজাতি' কথাটা ব্যবহৃত হতো না। বলা হতো 'আদিবাসী'। সমস্ত ক্রিয়াকর্মে ভূমিপুত্রদের সেই সম্মান জানানো হতো। সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভা পতনের পর সরকারি ক্রিয়াকর্মে এই যে 'উপজাতি' কথাটি এসে বাসা বাঁধলো ক্যান্সারের মতো, এই রাজ্যের জনজীবন তা থেকে আর মুক্তি পেলো না। আর এখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়বাড়ন্ত ভেদনীতির, পার্লামেন্ট থেকে আরম্ভ করে রাজ্যস্তর পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার কৃষ্টি

ও সাহিত্য জগতের অন্যতম পুরোধা প্রয়াত মহেন্দ্র দেববর্মার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। মহেন্দ্রদা 'উপজাতি' কথাটা ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলতেন, উপনদী যেমন নদীর মর্যাদা পায় না, উপ-পত্নী যেমন পত্নীর মর্যাদা পায় না, তেমনি উপজাতি বললে একটা জাতিকে অসম্মান করা হয়। 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহারই শ্রীমণ্ডিত এবং সম্মানজনক।

একথা সকলেই জানেন যে, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষি ভিত্তিক ছিলো। তার সুফলও হাতে-নাতে পাওয়া গেলো। দেশ খাদ্যশস্যে যে কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো তা নয়, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যথা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ায় খাদ্যশস্য বিপুলভাবে রপ্তানি করতে সক্ষম হলো। এতে আমেরিকার টনক নড়লো। তারা দেখে তাদের পশুখাদ্যের তথা সাহায্যের নামে পি এল ৪৮০-তে খাদ্য নেবে কে? ষড়যন্ত্র করে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দ্বিতীয় যোজনায় শিল্পের দিকে পরিকল্পনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হলো। আর তখনই ভারতের পঞ্চমবার্ষিকী যোজনার কফিন তৈরি আরম্ভ হলো। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে নয়া দিল্লীর বিঠলভাই প্যাটেল হাউজে ভূমি সংস্কার নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী এক জরুরী বৈঠক করেছিলেন লোকসভার গণ্যমান্য সদস্যদের নিয়ে। তাতে বক্তার তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে ত্রিপুরার দশরথবাবু মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেদিন তিনি যে উদার ও সর্বাত্মক কৃষক স্বার্থমুখী ভূমি আইনেব স্বপক্ষে ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে সারা দেশের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ সহ রাজনৈতিক নেতাদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিলো। তারা ভেবেই পেলো না ঘন জঙ্গল, টিলা আর পার্বত্যভূমিতে গড়া অঞ্চলের প্রতিনিধি কি করে এত উন্নত কৃষক স্বার্থমুখী ভূমি সংস্কার আইনের কথা চিন্তা করতে পারলো।

অথচ অদৃষ্টের কি পরিহাস! সেই দশরথবাবুর মন্ত্রীত্ব থেকে সুদীর্ঘকাল অতিক্রম করে মুখ্যমন্ত্রীত্বকাল পর্যন্ত তার সে ঐতিহাসিক বক্তব্যের কোন স্বপ্নই তিনি সার্থক করতে পারলেন না। কৃষি ক্ষেত্র সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেলো না। জুমিয়ার সংখ্যা বেড়েই চললো, প্রান্তিক এবং উপ-প্রান্তিক চাষিরা আজ ভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বনাশা দ্বিতীয় ভূমি জরিপের ফলাফল কারও অজানা নয়। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যায় উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার অভ্যন্তরে কত হাজার প্রান্তিক এবং উপ-প্রান্তিক আদিবাসী চাষি তার ভূমি হারিয়েছে, কত উর্বরা জমি এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, কত আদিবাসী কৃষক এখন হয় জুমিয়া নয় রাজ্যান্তরী, নয়তো রুজিরোজগারহীন হয়ে পড়েছে। কি চরম বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়েছে তারা মাত্র কয়েক বছরের সৃষ্ট নব্য ভুঁই ফোঁড় উপজাতি শোষক শ্রেণীর হাতে, এ আমলের প্রশাসনের শঠতার কাছে।

আদিবাসী এলাকার উন্নয়নের নামে আনা কোটি কোটি টাকার সদ্ব্যবহার করলে তো সোনায় সোহাগা। নিদেনপক্ষে তাদের স্ব স্ব নামে যদি ব্যাঙ্কেই অনুমোদিত টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা যেতো, তাহলে মাসে মাসে এই গরিব আদিবাসীরা প্রতি মাসে যে কয়েক হাজার

টাকা করে সুদ পেতো, তাতেই নিশ্চিন্ত আরামে মাথার উপর ছাউনি সহ বাস করে তাদের 'রাজা'-কে আশীর্বাদ করে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। এই প্রবঞ্চনাই কেবল এই আদিবাসীদের শেষ কথা নয়। কেন্দ্র আর রাজ্য মিলে শত শত কোটি টাকা আর হাজার হাজার টন খাদ্য বরাদ্দ হয়েছে তাদের নামে আর তা প্রশাসনের মাধ্যমে রাঘব বোয়ালেরা হজম করে নিয়েছে। এদের অদৃষ্টে সেই বঞ্চনা আর প্রতারণা, দুঃখ আর দুর্দশা। আর এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিকভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে সংখ্যাগুরু অংশের প্রতি। এ এক প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজি।

ত্রিপুরায় সরকারি ভাষাকে বাংলা ভাষা করার জন্য বেসরকারি প্রস্তাবটিকে ১৯৭৯ সালে সি পি এম-এর তরুণ নেতা তথা এম এল এ অভিরাম দেববর্মাই বিধানসভায় এনেছিলেন। অভিরামবাবুর সেদিনের ভাষণ তো সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সে দিনের বিধানসভার সচিব পি কে দেববর্মণ আজও জীবিত। রেকর্ডও রয়েছে অক্ষত। এর আগেই বর্ষীয়ান নেতা দশরথবাবু ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছিলেন একটি বইয়ের মাধ্যমে, যার নাম 'ককবরক বাংলা হরফে চাই কেন?' অথচ আজ কি অসহনীয় অবস্থা! পাহাড়ি অঞ্চলের বাংলার মাধ্যমের স্কুলগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে, কি সরকারি কি বেসরকারি। কিন্তু সে সব এলাকায়ই ছত্রাকের মতো গড়ে উঠেছে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলি। এখানে কোন বৈরী তাণ্ডব নেই। সব তাণ্ডব বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর বেলায়! ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলোর বেলায় কোন হাঙ্গামা নেই তো ভালো কথা, কিন্তু সরকারি স্কুলগুলোই বা বন্ধ কেন? বিধানসভায় তো প্রতিবারই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মাননীয় সদস্যদেব এই বন্ধের সংখ্যা, ড্রপ আউটের সংখ্যা জানিয়ে আসছেন, কিন্তু খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে কোথায়?

এরই মধ্যে একটি কালো ছায়া প্রলম্বিত হয়ে গ্রাস করতে আসছে। সেটি হলো ১৯৭৩ সালে নাগাল্যাণ্ডের ছেদিমায় অনুষ্ঠিত প্যান ট্রাইবেল কনফারেন্স। এই কনফারেন্সের ইতিহাস কি? উদ্দেশ্যই বা কি? এর সাথে আজকের ইনার লাইন পারমিটের দাবি আর দেব মন্ত্রীসভা আমলের নবতর ভূমি সংস্কার আইনের কি কোন সম্পর্ক নেই? এ সমস্ত অবাঞ্ছিত অথচ জ্বলন্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো আজকের প্রশাসন দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে, কিন্তু ইতিহাস কি তা ক্ষমা করবে? প্রজন্ম কি নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবে?

কমন আইডিন্টিটি প্রশ্নে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও এটা সুনিশ্চিত যে আমাদের সকলের কমন ডেস্টিনি হচ্ছে ভারত নামক দেশের নিয়তি। সে নিয়তি কোন ট্রাইবেলের নয়, কোন নন-ট্রাইবেলের নয়, কোন বাঙালির নয়, কোন অবাঙালিরও নয়। সাম্প্রদায়িক নির্বুদ্ধি এই দেশকে বিভক্ত করেছে এই ১৫ই আগস্টেই। বারবার বিভক্ত হতে করতে পারে যদি আমরা আমাদের এই যৌথ যাত্রার কথা ভুলে যাই। বিভেদ নীতিতেই ইংরেজ আমাদের বিভক্ত করে ভ্রাতৃরক্তে অবগাহন করে প্রায় একশ নব্বই বছর ধরে রাজত্ব করে গেছে নির্বিবাদে, এ কথা কি আমাদের স্মৃতি থেকে পঞ্চাশ বছর পার হতেই মুছে গেছে? প্রবীণরা অবিশ্বাসে দুলছেন। তাঁরা আর কত রক্ত দেখবেন? কত নদী রক্তের পর এই গহন পাহাড় আর পাহাড়ি নদী তাদের জন্য শান্তি

বারির স্রোত বহন করে আনবে? এই ত্রিপুরাসুন্দরীর ভূমিতে তাদের শান্তির নীড় গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব হবে? আবার ত্রিপুরার পার্বতী জননী 'বৈনারী' পাততে যাবেন কোন বাঙালির ঘরে?

শিশুকণ্ঠের সেই আর্তনাদ কি ঘাতকদের বুকে বিন্দুমাত্রও তোলপাড় তুলবে না— 'মা গো! এত রক্ত কেন?' মা ত্রিপুরাসুন্দরী কি আবার বরাভয় মুদ্রায় প্রশান্তির হাসিতে তার সন্তানদের অভয় মন্ত্রে দীক্ষা দেবেন না?

অনেক স্বপ্ন আর স্বপ্নহীনতার, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির অজস্র হিসাবনিকাশেরও পরেও স্বাধীনতার অর্ধশতক পার হওয়া এই মহান সুবর্ণ ভারতের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে, আমরা এমন এক দেশের নাগরিক, যাদের এখনও স্বাধিকার শব্দের পূর্ণ মানেই সুকৌশলে বুঝতে দেয়া হয় নি। লোকমান্য তিলকের যে উদাত্ত কণ্ঠ ঘোষণা করেছিলো একদিন, 'স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার।' সেই অধিকার পেয়েও তাকে লালন-পালনের ও মমতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণের দায়টুকু আমরা যেন কেউই স্বীকার করিনি। নইলে একটা স্বাধীন দেশ , যেখানে আজও দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে পঞ্চাশ শতাংশের ওপর মানুষ, কোটি কোটি শিশু স্কুলে যেতে পারে না, সর্বত্র নেই বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা, নেই সঠিক সুনিয়ন্ত্রিত কোন সার্বিক শিক্ষানীতি। এই অনেক 'নেই'-এর ভেতর 'আছে'-র তালিকাও কম দীর্ঘ নয়। আছে প্রহসনে পরিণত এক গণতন্ত্র, বেকারি, ক্ষুধা, বিক্ষোভ, হতাশা, নষ্ট মূল্যবোধ, আছে ক্রোধ ও অভিমান — যা থেকে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অনিশ্চিত অখণ্ডতা। হ্যাঁ, তবুও আমরা স্বাধীন। আমরা স্বাধীন চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের ভেতর, ধর্মকে বর্ম বানিয়ে তোলা তথাকথিত রাজনীতির আত্মরক্ষার ভেতর, সমস্ত মানবিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গর্বোদ্ধত পারমাণবিক হুমকি ও যুদ্ধের জিগীর তোলা কোলাহলের ভেতর। সেই গভীর কোলাহলের ভেতর থেকে তবু কখনো-সখনো শোনা যায় সেই অমোঘ মন্ত্রোচ্চারণ —'চরৈবেতি, চরৈবেতি। ....

এই বিপর্যয় ও আজকের অগ্নি-শপথ

এক মহা বিপর্যয় এবং দুর্যোগের ভিতর দিয়ে দেশের সমগ্র উত্তর মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের জীবনযাত্রা বহুদিক থেকে বিপন্ন দেখা যাচ্ছে। এই দুর্যোগের ফলে আমাদের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কেবলমাত্র নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরও অত্যন্ত অনিষ্ট হচ্ছে, খুবই ক্ষতি হচ্ছে। যারা হতাহত হয়েছে, যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে — তারা আজকের এই দুঃখকষ্টের কাঠগড়ায় বলি হয়েছে। কিন্তু এটাই শেষ নয়। এই যে নিষ্ঠুর আঘাত ভারতের নাগরিকদের উপর এসেছে, এটা সহজে মিটবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ আঘাত থেকে যে সৎশিক্ষা হওয়া উচিত, সে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি। আঘাত যখন আসে, বিপর্যয় যখন আমাদের গ্রাস করে, তখন কিছু সেবা মনোভাবসম্পন্ন সংগঠন বা ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। সরকারও কিছু দানখয়রাতির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এসবই সাময়িক। এ বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় যেকোন সাহায্যই অতি তুচ্ছ। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমরা সকলেই তাকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছি। দুস্থ, পীড়িত, গৃহহীন, সর্বহারাদের জন্য আমরা কিছু করলাম, আর তাতেই সব দায়িত্ব আর কর্তব্য শেষ হয়ে গেলো ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু তা নয়। এর থেকে আমাদের শিখে নিতে হবে সত্যিকারের বিপদটা কি। এর মূল্য কোথায়। আমরা ভারতবর্ষের কি রকম নাগরিক হয়েছি, ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি? এদেশের মানুষের প্রতি আমাদের হৃদয়ের কতটুকু টান রয়েছে সে পরীক্ষা এবং সমীক্ষা করার সময় আজ এসেছে। সে পরীক্ষা এবং সমীক্ষা করে দেশ জুড়ে কতগুলি নিবন্ধ পাঠ বা বড় বড় সভা হলো, বক্তৃতা হলো, তাতে কিন্তু বাস্তবে কিছুই হবে না। এ আঘাত কিছুই না। আরও প্রচণ্ড আঘাত ভারতবাসীর উপর আসবে, আসতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়লে বোঝা যাবে দেশবাসীর মনে যখনই এই খণ্ড খণ্ড চিন্তা এসে বাসা বেঁধেছে, তখনই তারা আত্মহননের লীলায় মত্ত হয়েছে। আর ঠিক সে সময়েই দেশ বিদেশী আক্রমণের শিকার হয়েছে। তখনকার যুগে যে বিদেশী আক্রমণ ছিলো, অন্য দেশের ভূমি দখল নিয়ে রাজ্যসম্পদ জয় করার জন্য, এ যুগে তা দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক লড়াই

রূপে। ভাতে মারার ষড়যন্ত্র হিসেবে। এত যে সুজলা সুফলা ভারতবর্ষ, তার উপর শত শত বছর ধরে রাজত্ব করে গেলো ব্রিটিশ। তার আগে করেছিলো মোঘলরা দুইশ বছর। প্রথমে তারা ছিলো মুষ্টিমেয় কতগুলো লোক। কিন্তু তারাই দাসত্বের শিকল আমাদের হাতে-পায়ে পরিয়ে দিয়ে নির্বিবাদে রাজত্ব করে গেলো শতাব্দীর পর শতাব্দী। আমরা খণ্ডিত ছিলাম বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। আজকেও তাই আমাদের এ দুর্গতির সঠিক কারণ কি, কেনই বা তা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, সে তথ্য খুঁজে বের করার সময় এসে গেছে। তা না হলে শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না। অপেক্ষা করে দেখুন, শীঘ্রই তা সারা ভারতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে। যদি আমরা জেগে না উঠি, আমাদের মানবিক চেতনায় বিশেষ ধ্যান না দিই একথাকে বুকে রেখে যে আমি ভারতের নাগরিক, এদেশের সুখ-দুঃখের মধ্যেই আমার সুখ-দুঃখ, আর যতক্ষণ আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকবো, কেবল নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, ততক্ষণ কিন্তু এ বিপত্তি যমরাজের দণ্ড নিয়ে আমাদের পিছন পিছন চলতে থাকবে।

এখনও সময় আছে আমাদের চোখ খোলার জন্য। চেয়ে দেখুন, কাশ্মীর হয়ে পাঞ্জাব, তারপর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছুঁয়ে এগুতে এগুতে অসম, মেঘালয়, মণিপুর হয়ে ত্রিপুরা। অপরদিকে মধ্যভারত থেকে আস্তে আস্তে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতট। আবার পূর্বভারত থেকে মধ্যভারত। অর্থাৎ গোটা দেশটাই এদের জালে বাঁধা পড়েছে, নানাভাবে নানা মতে। কিন্তু উদ্দেশ্য এক। দেশের ঐক্য বিনষ্ট করা। লক্ষ্য করুন, এ আঘাত যারা ক্রমাগত হেনে চলেছে, তারা মাস্টার প্ল্যানার্স। এদের ক্ষতি করার নিষ্ঠুরতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এরা ঠাণ্ডা মাথায় সুদক্ষ পরিকল্পনায় ক্রমাগত আঘাত হানছে আমাদের জাতির মাথায়, অথচ আমরা এখনো সম্বিতহীন হয়ে পড়ে আছি। তাই আজকে আমাদের কিছু অংশের মাথা ফাটছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে — আর আমরা মিটিং-মিছিল খেলায় মত্ত হয়ে আছি। তাই আড়াল থেকে ওরা হাসছে আর ক্রমে ক্রমে আরো ক্রূর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জাতীয়তার বাণী উচ্চারণের সময় আমরা আহ্বান জানাই উদাত্ত কণ্ঠে, 'জাগো হে ভারতের জনতা/ একজাতি এক প্রাণ একতা।' অথচ কাজের বেলায় এদেশেরই রক্তমাংসের মানুষের এক অংশকে এদেশের মানুষ হিসেবে সম্মান না করে জাতি হিসেবে বুকে টেনে না নিয়ে, কিছু সুযোগ-সুবিধা কিছু স্বার্থের আফিম খাইয়ে একটা উপসর্গের সংযোগে মানবতার অসম্মানজনক একটা শব্দ তৈরি করে, 'উপজাতি' আখ্যা দিয়ে চিরতরে আলাদা করে দিয়েছি এক দেশ এক জাতি তত্ত্বের বুকে কুঠার হেনে। তাতেও সব শেষ নয়। স্বার্থের ফাঁদে, পিছিয়ে পড়ার এক অজুহাত তুলে কিছু সুবিধা, কিছু সুযোগ দিয়ে আত্মহননের তীক্ষ্ণ ছোরা কিছু লোকের হাতে তুলে দিয়ে ভারত ঐক্যের রামধুন গাইছি। কিছু লোকের ঘরে বঞ্চনার আগুন দিয়ে অন্যের কাছে প্রশান্তি মাগছি। আমার ঘরে আগুন জ্বালালে একদিন জ্বলে ছাই হবে আপনার ঘরও। ধ্বংস হবো আমরা দুজনেই। একের সুবিধা প্রদান যাতে অন্যকে বঞ্চিত না করে, সে

দূরদর্শিতা থাকতে হবে। না হলে আমায় জ্বালিয়ে *আপনি সুখে থাকবেন, এ সত্য কিছুদিন সত্য হতে পারে, চিরকালের জন্য নয়। বঞ্চনা মানুষকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে।*

আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার কথাই ধরা যাক। এখানে প্রায় বত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। আমরা যদি এক হয়ে যাই, এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাই, যে কোন অনিষ্ট চিন্তা এখানে ঢুকতে দেবো না — তাহলে এমন কোন শক্তি নেই, তাতে বোমা মেরেও ফাটল ধরাতে পারে। তাই এখন প্রয়োজন শুধু স্বদেশ ভাবনার। এ দেশের মাটির তথা এ রাজ্যের উলঙ্গ, গরিব, হাভাতে মানুষগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে এদের দু-বেলা দু-মুঠো ভাত, একটু থাকবার জায়গা, লজ্জা নিবারণের একফালি কাপড় আর একটু শিক্ষার আলো যোগাতে পারলেই, মুষ্টিবদ্ধ হাতে এরা বীরদর্পে এগিয়ে আসবে দেশের কাজে। এই একাত্মবোধটাই আজকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর তাই হবে আজকেব অগ্নি শপথ।

প্রাসঙ্গিক চিত্র

২৯ জানুয়ারী ১৯২৮, ত্রিপুরানৃপতি বীরবিক্রমের রাজ্য অভিষেক উপলক্ষে বাংলার গভর্ণর লর্ডজ্যাকসন-এর বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে রাজ্যে পদার্পণ এবং অনুষ্ঠানে যোগদানের স্মৃতি উপলক্ষে নির্মিত 'জ্যাকসন গেইট' (অধুনা বিলুপ্ত)।
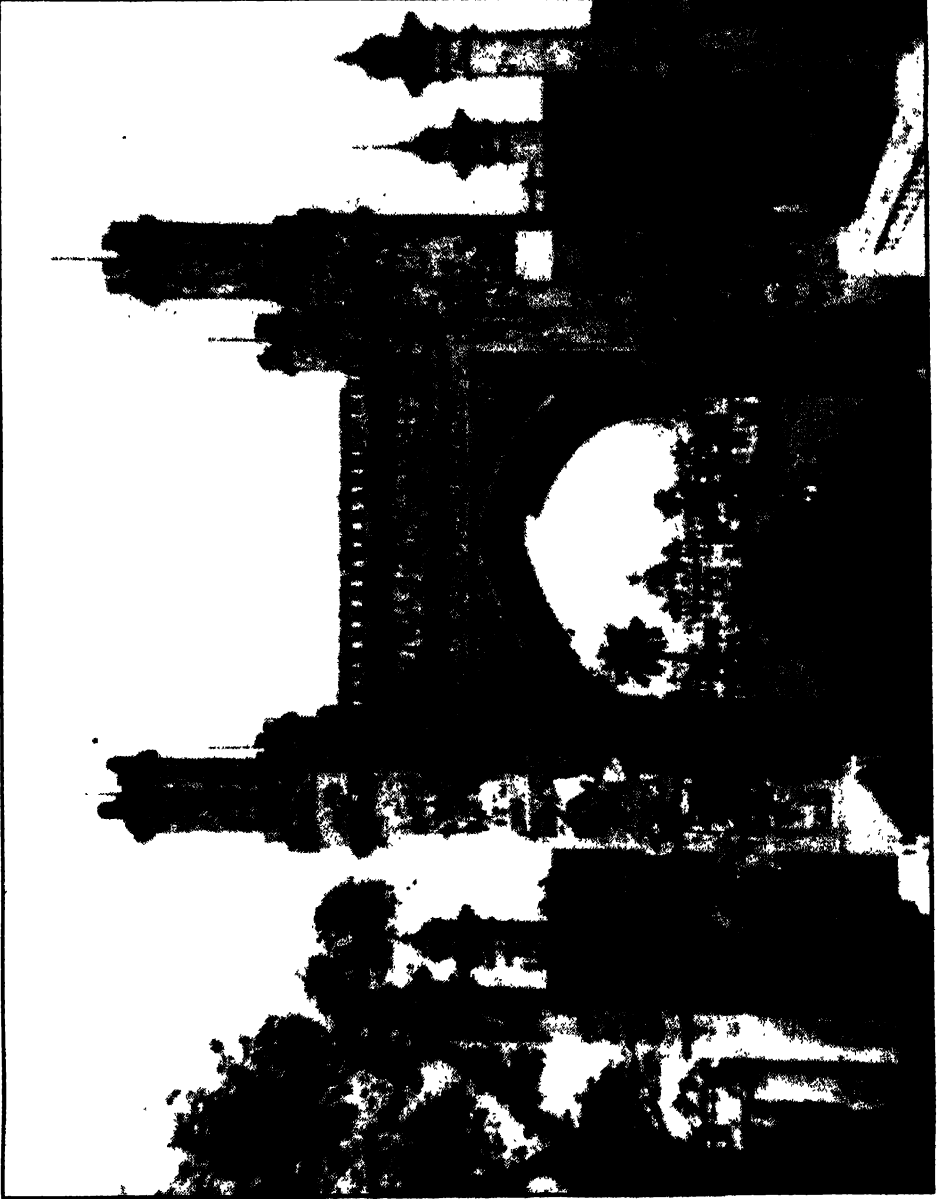
বর্তমান চিলড্রেন্স পার্কের
সম্মুখভাগের রাজপথ।
অদূরে লায়ন্স গেইট
তথা বর্তমান
বিধানসভার প্রবেশ ফটক।
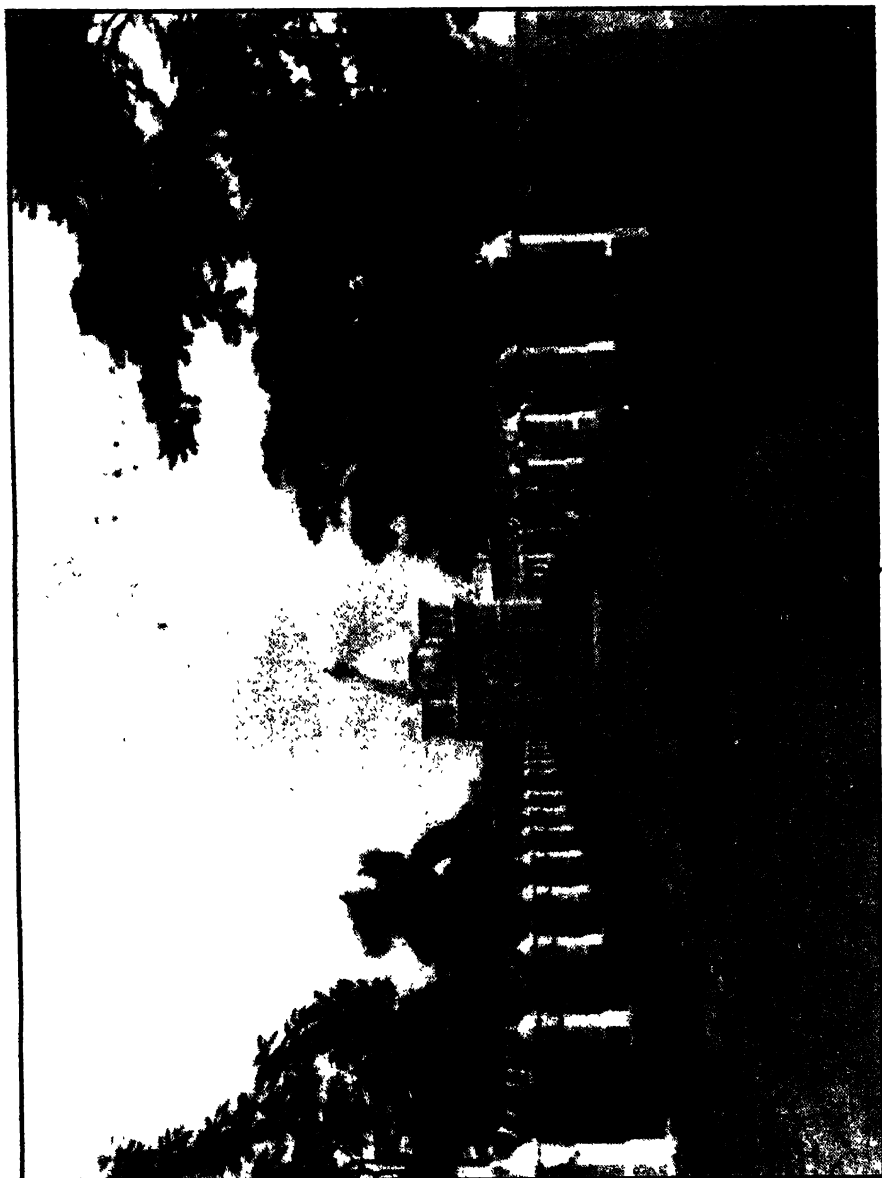
উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ
যা বর্তমান বিধানসভা
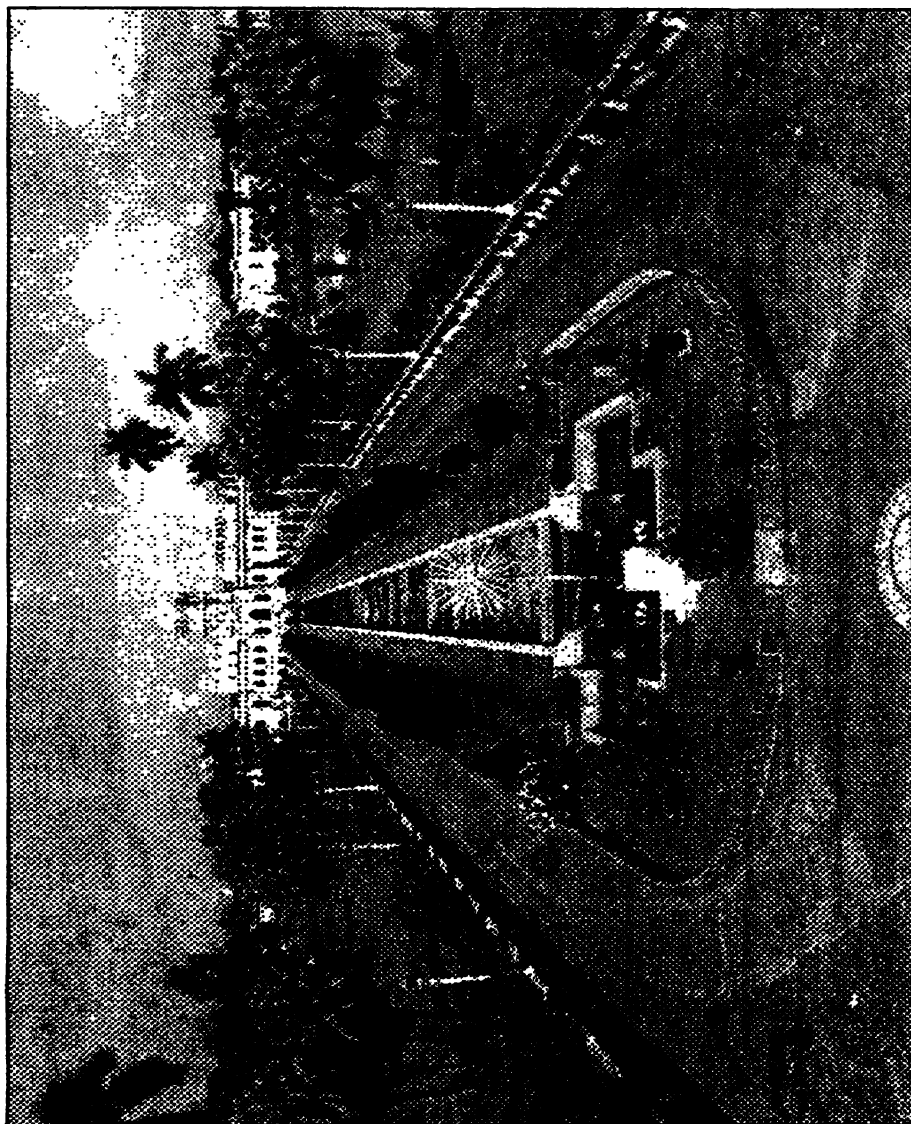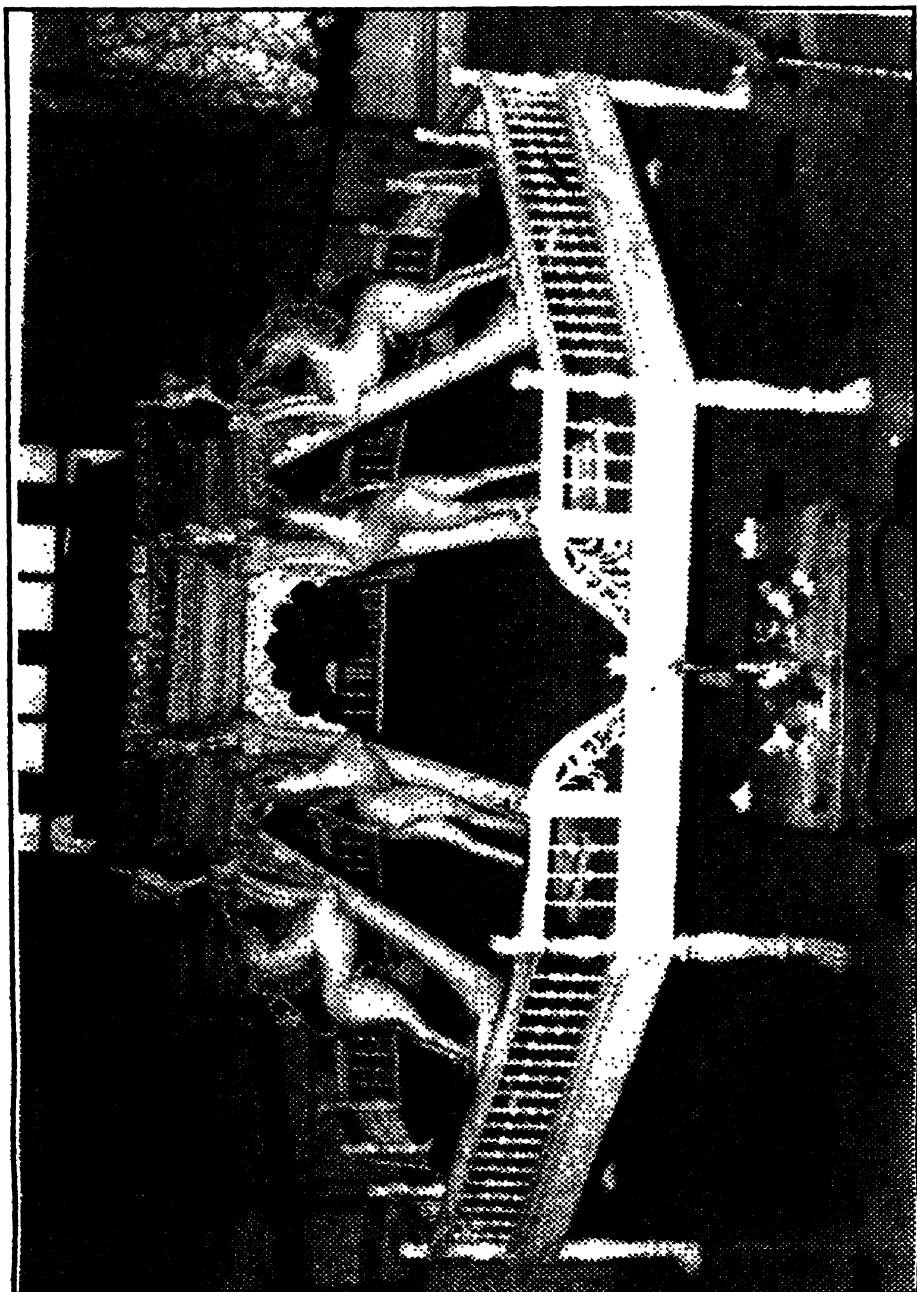
রাজ সিংহাসন
(গজদন্তনির্মিত)।

রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ রাধাকিশোরের দরবার।
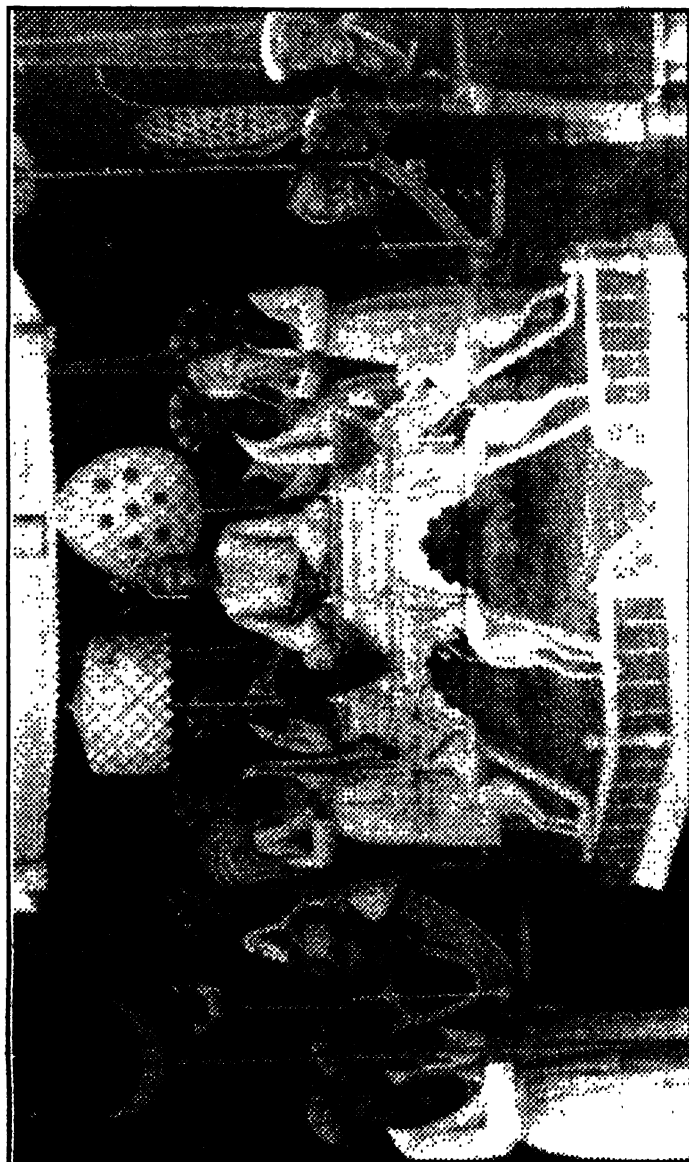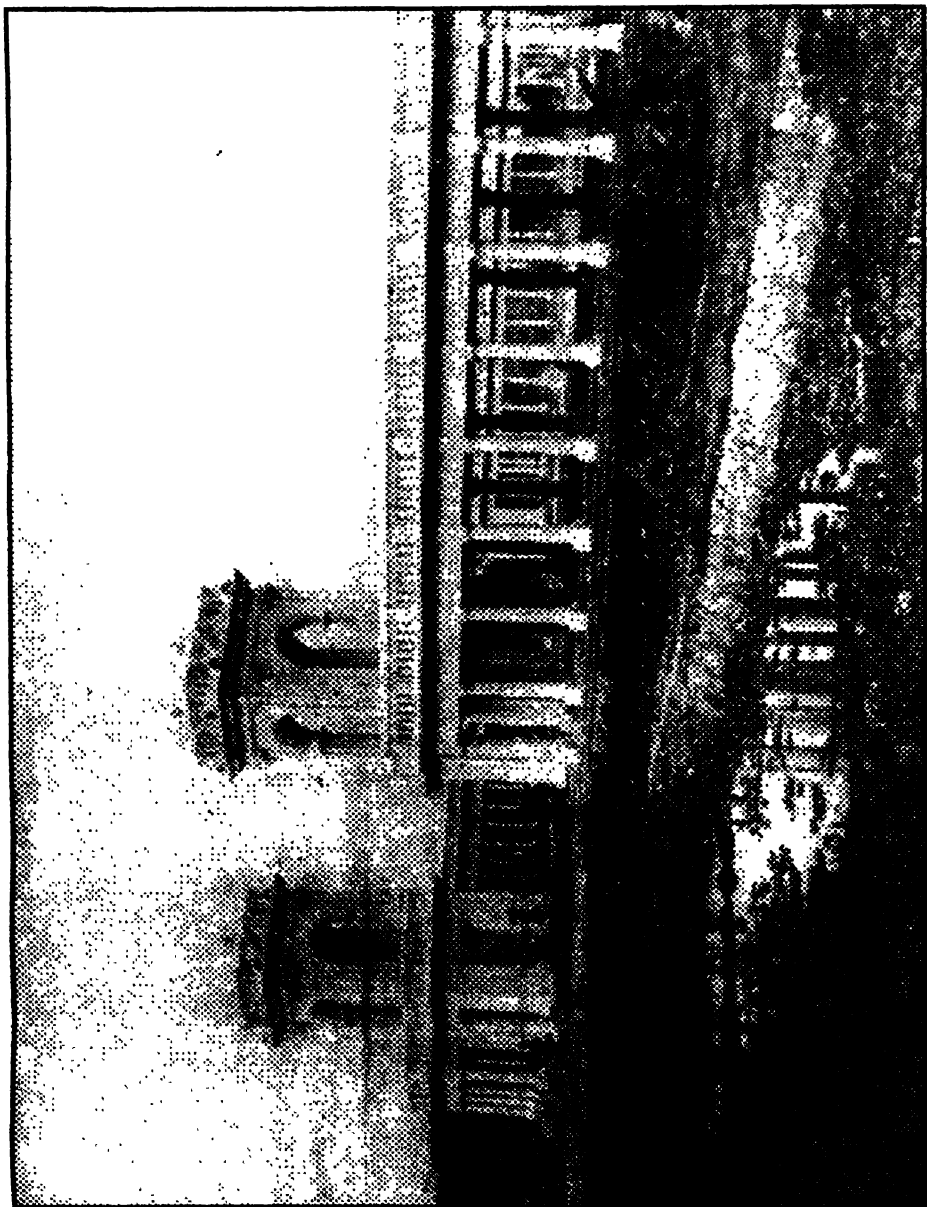
১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে
মহারাজ বীরবিক্রম নির্মিত
অধুনা বিলুপ্ত
মহারাজগঞ্জ বাজারের
শেষ প্রান্ত।

৭.৩.১৯৭০. অনতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে উমাকান্ত একাডেমির প্রবীণতম ছাত্র মহারাজ আমলের মন্ত্রী কামিনী কুমার সিং মহোদয়ের উমাকান্তের পতাকা উত্তোলন।

৭. ৩. ১৯৭০। প্রাক্তন ও
বর্তমান ছাত্রদের
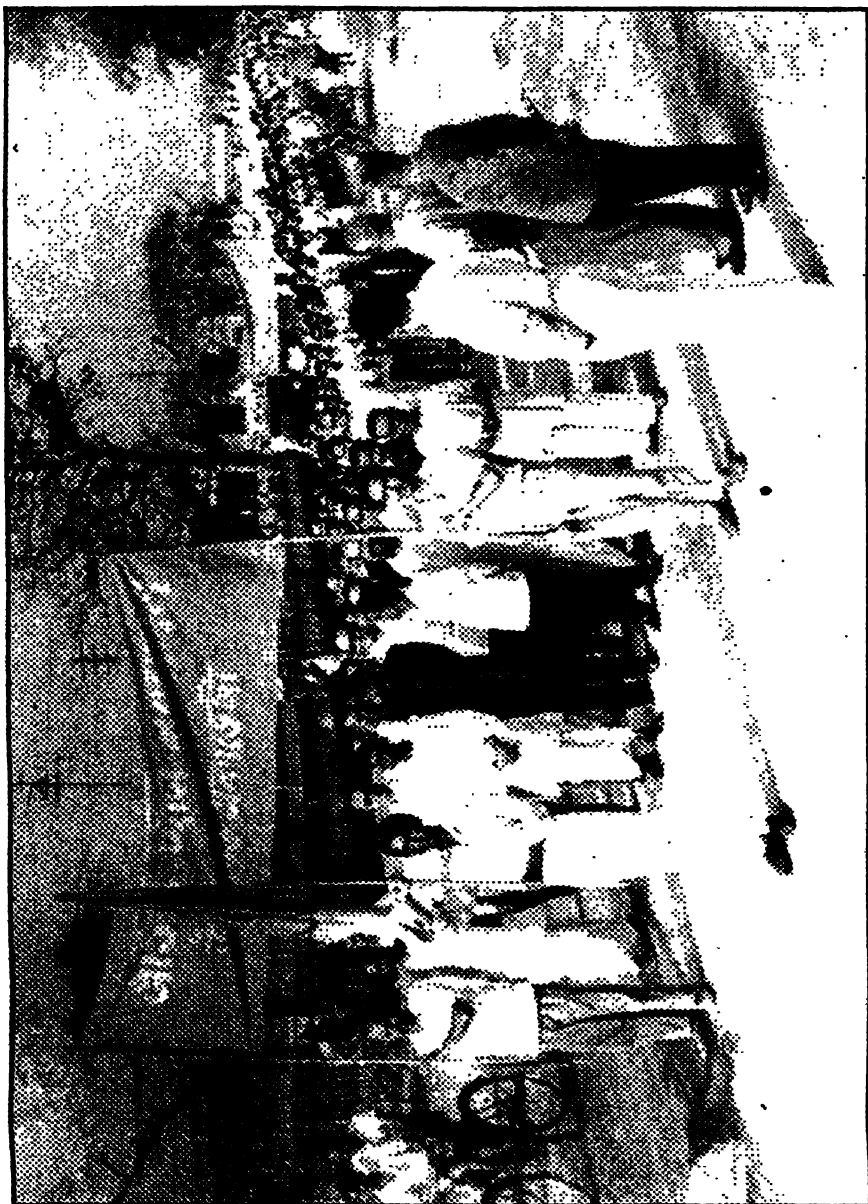
শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সঙ্গে
সপারিষদ মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য।
পেছনে বাঁদিক থেকে শ্রী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
যোগেন্দ্র দেববর্মা, ডা. অবনীশ্বর সেনগুপ্ত.
মহারাজ রাণা বোধজং বাহাদুর
এবং সোমেন্দ্র দেববর্মা।
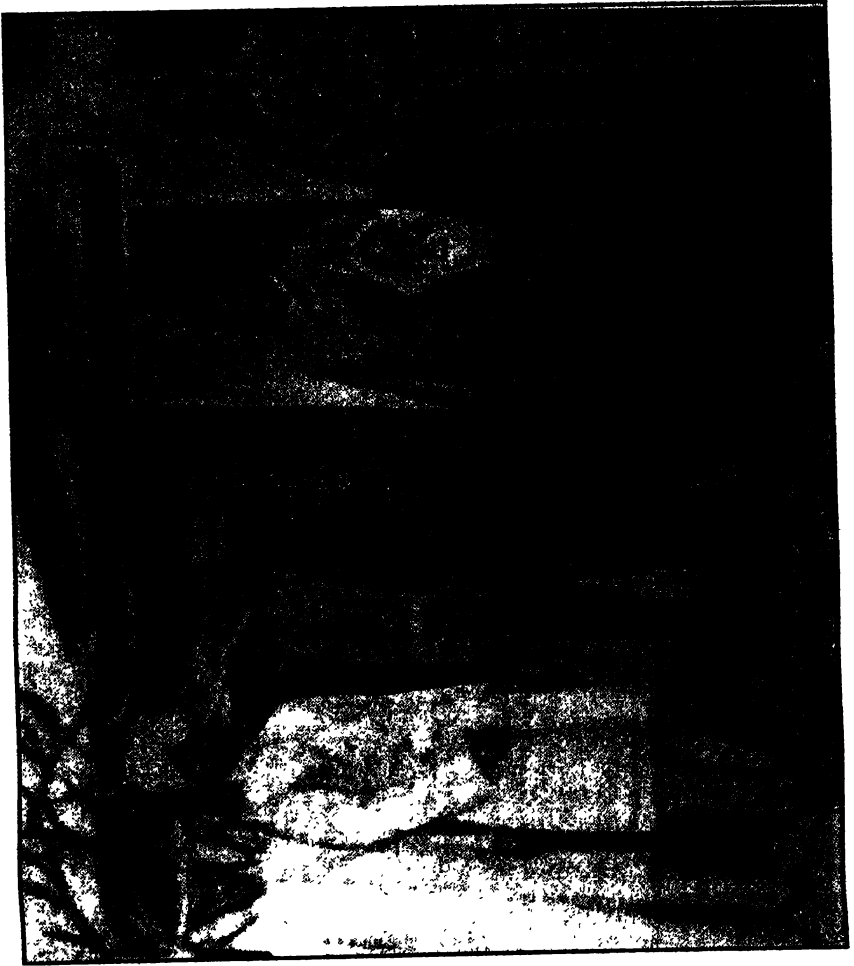
পুরাতন কুঞ্জবন বাংলো
(মালঞ্চাবাসের পূর্বতন
বাড়ি), আগরতলা।
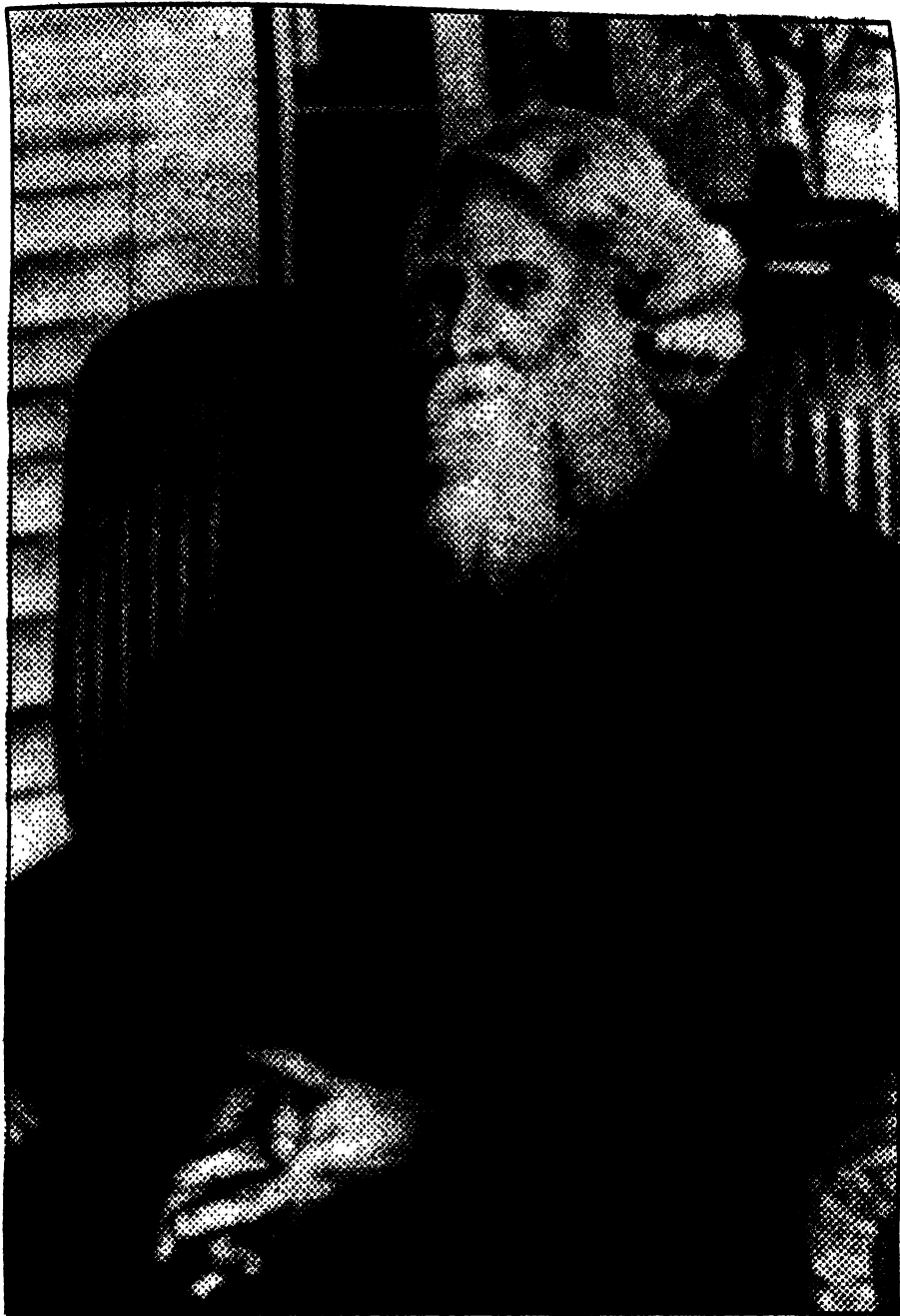
কুঞ্জবন প্রাসাদে আগরতলায় শেষবারে রবীন্দ্রনাথ।

কবির নীড় (জলরঙ)। শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ভারতভাস্কর মানপত্র
গ্রহণের পর কবির
প্রত্যুত্তর পাঠরত
কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ।

কবিসান্নিধ্যে
মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর
(শান্তিনিকেতন)।